

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮৩

প্রকাশক ঃ
প্রদীপ বসু
বুকমার্ক
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

মুদ্রক ঃ
মলয় কুমার দত্ত
১৮এ, রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলকাতা—৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম বসু

ওয়াল্ট হুইটম্যান ভালো এবং যথার্থ কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: ভালো কবিকে বিষয়বস্তুর জন্যে অন্ধের মতো হাতড়ে মরতে হয় না, সামান্য ঘাসের ডগাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর কল্পনার পাখাকে মেলে দিয়ে এক অসাধারণ রূপে এবং রসে মণ্ডিত করে তোলেন। হুইটম্যানের দেওয়া এই সংজ্ঞা কৃষণ চন্দর সম্বন্ধে অনায়াসেই প্রয়োগ করা চলে। একজন ভালো কবির মতোই তিনি একজন মহৎ গল্পকার। সামান্য থেকে সামান্যতর জিনিস বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর কল্পনাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন—নিয়ে গিয়েছেন গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধি, চেতনা ও মননের জগতে। আর এই জগতে প্রবেশ করে পাঠক বিস্ময়ে দেখেন তার পরম আত্মার অপরূপতা, নগ্নতা এবং গরীমাকে। একই ধারায় প্রবাহিত তাঁর চিন্তা আচমকা এমন ধাক্কা খেয়ে এক নতুন উপলব্ধি, এক নতুন জগতের মুখোমুখি দাঁড়ায় যা তাঁর কাছে অচিন্ত্যনীয়। কৃষণ চন্দরের সার্থকতা এখানেই। তাঁর চেতনার উপলব্ধি এক থেকে বহুতে মিলে বাস্তবের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে যুক্ত হয়েছে—লালিত হয়েছে। আর, তাৎক্ষণিককে তিনি উত্তরিত করেছেন ঐতিহাসিক বাস্তবতায়।

কৃষণ চন্দরের এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং শ্রেণী সচেতনতা এসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। এই সময়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের মতো আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের রচনাবলী, অধ্যয়ন করেছেন সমসাময়িক ভারতীয় নেতা—গান্ধী এবং নেহরুর রচনাবলী—তাঁদের কর্মপদ্ধতি। আর ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন জাতীয় নেতাদের নির্লজ্জ বেইমানী। এই বেইমানী তাঁর অন্তরাত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে—তাঁকে নতুন দিগ্‌দর্শনে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। তিনি নিজেই বলেছেন, এই ঐতিহাসিক চেতনা, এই সংগ্রামী উপলব্ধি এসেছে নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষের লড়াই-এর অন্তঃস্থল থেকে। সেই অন্তঃস্থলে তিনি সাঁতরিয়ে বেড়িয়েছেন—তুলে এনেছেন মানুষের হৃদয়ের সেই অজানা-অচেনা মূক বিশ্বাস এবং আকাঙ্খাকে।

কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এবং পার্টির একজন সক্রিয় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর এই একাত্মতা তাঁকে আরও ব্যাপকভাবে সাধারণ ও সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়। তিনি তেলেঙ্গানার কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ছিলেন—উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের সংগ্রামী প্রেরণার উৎস, মনোবল এবং মূল্যবোধকে।

তিনি ঘুরেছেন বোম্বাই-এর শ্রমিক মহলে আর শ্রমিক বস্তিগুলিতে, দেখেছেন অঙ্কুরিত শ্রেণী-জাগরণকে। দেখেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাহাজী ধর্মঘটী এবং শ্রমিকদের ব্যারিকেড লড়াই। এই লড়াই—এই জাগরিত নতুন মূল্যবোধকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর অনেক গল্পে। যে গল্পগুলি শুধু মাত্র গল্প হয়ে থাকেনি—হয়ে উঠেছে ইতিহাসের দিনপঞ্জী—ইতিহাসের মর্মবানী।

পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের ভোলে-ভালে কৃষকদের—যাদের তিনি তাঁর শিশু এবং কিশোর বয়স থেকে দেখে এসেছেন, তাদের সেই দুঃখ-দুর্দশাকে গভীর মমতার সঙ্গে রূপায়িত করতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। কাশ্মীরের অসীম সৌন্দর্য—যে সৌন্দর্যের নীচে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার ভুখা মানুষের চোখের জল, ভালোবাসা, ঘৃণার ধিকি ধিকি আগুন, আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে তিনি এক নতুন উপলব্ধির জগতে নিয়ে গিয়েছেন।' কাশ্মীর হচ্ছে কৃষণ চন্দরের আত্মা। এ আত্মা সৌন্দর্যের শাশ্বত রূপের আত্মা নয়—গুমরে গুমরে কেঁদে-ওঠা এক রক্তাক্ত আত্মা—যে আত্মা কাশ্মীরের হাজারো নাঙ্গা-ভুখা নির্যাতিত মানুষের শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে উদগ্রীব। এই আত্মাকে একমাত্র কৃষণ চন্দরই দেখতে পেয়েছেন।

কাশ্মীর থেকে কৃষণ চন্দর ছুটে গিয়েছেন পাঞ্জাবে—তাঁর কৈশোর-যৌবনে দেখা পাঞ্জাবে। কাশ্মীর যদি তাঁর আত্মা হয় পাঞ্জাব তাঁর দুই চোখ। এই চোখ তাঁর চেতনাকে—তাঁর মেধাকে শাণিত করেছে। আর এই শাণিত চেতনা নিয়ে যোদ্ধার বেশে তিনি নেমে এসেছেন রণপ্রান্তরে—যে প্রান্তর রক্তে আর শৌর্যে আপ্লুত।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের নির্যাতিত মানুষের মধ্যে কৃষণ চন্দর পরিভ্রমণ করেছেন—সেখান থেকে তুলে এনেছেন এক একটি বৈচিত্র্যময় আর্তস্বর—এক একটি রক্তকমল। সেই আর্তস্বর—সেই রক্তকমলকে তিনি তাঁর বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছেন ভাস্বরিত নীল আকাশের দিকে। অসম সমাজ ব্যবস্থাকে যারা টিঁকিয়ে রাখতে চায়—যারা প্রগতিকে প্রাণপণে প্রতিহত করতে চায় তিনি ছিলেন তাদের প্রতি ক্ষমাহীন—নির্দয়। নতুন পৃথিবী—নতুন ভারতবর্ষ রচনার জন্য যারা উন্মুখ—সেই সচেতন-অচেতন উন্মুখতাকে তিনি সংগঠিত করার জন্যে কলমকে হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলি এই সংকলনে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে বহুদিন আগেই। পরিমার্জিত এই সংস্করণে চারটি নতুন গল্প যোগ করা হয়েছে। অনুবাদের সময় কৃষণ চন্দরের মেজাজ, ঢং এবং ভঙ্গিমা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে—এমন কি ভাষাগত বিন্যাসও।

কমলেশ সেন

কৃষণচন্দরের শ্রেষ্ঠ গল্প

সূচী

উর্দু সাহিত্যের অন্যতম গল্পকার

সাদাত হোসেন মণ্টো-র

ভিন্ন দেশ ভিন্ন মানুষ

অনুবাদ : কমলেশ সেন

জামগাছ

রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গিয়েছে। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর লনের জামগাছটা সেই ঝড়ে উপড়ে পড়েছে। ভোরে মালি দেখতে পেল গাছটার নীচে একজন মানুষ চাপা পড়ে আছে।

মালি ছুটতে ছুটতে চাপরাসির কাছে গেল—চাপরাসি ছুটতে ছুটতে ক্লার্কের কাছে গেল—ক্লার্ক ছুটতে ছুটতে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে গেল।

সুপারিনটেনডেণ্ট ছুটতে ছুটতে বাইরের লনে এলেন। দেখলেন ঝড়ে উপড়ে-পড়া গাছের নীচে যে মানুষটি চাপা পড়ে আছে তার চারদিকে বেশ ভীড় জমেছে।

একজন ক্লার্ক আক্ষেপ করে বলল, আহা, এই জামগাছে কতই না ফল ধরত।

আর একজন ক্লার্ক তাকে মনে করিয়ে দিল, আর এর জাম কী রসেই না ভরপুর ছিল।

তৃতীয় ক্লার্কটি বলল, ফলের মৌসুমে আমি ঝোলা ভর্তি করে এই ফল নিয়ে যেতাম। আর আমার বাচ্চারা কত আনন্দেই না এই জাম খেত।

মালি গাছের নীচে চাপা-পড়া মানুষের দিকে ইশারা করে বলল, আর এই মানুষ?

'হাঁ, এই মানুষ……।' সুপারিনটেনডেণ্ট খুব চিন্তায় পড়লেন। একজন চাপরাসি জিজ্ঞেস করল, জানি না এ বেঁচে আছে না মরে গেছে।

অন্য একজন চাপরাসি বলল, বোধ হয় মারাই গেছে, এত ভারী গাছ কোমরের ওপর পড়লে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

গাছের নীচে চাপা-পড়া মানুষ বেশ রুক্ষ স্বরে বলল, না, আমি বেঁচে আছি।

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আরে বেঁচে আছে!

মালি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলল, গাছটিকে সরিয়ে মানুষটিকে এর নীচ থেকে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।

একজন ফাঁকিবাজ হৃষ্টপুষ্ট চাপরাসি ভারিক্কিচালে বলল, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। গাছের গুঁড়িটি বেশ ভারীই হবে।

মালি জিজ্ঞেস করল, সোজা নয় কেন? সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব যদি হুকুম দেন, তবে আমরা পনেরো-বিশজন মালি চাপরাশি আর ক্লার্ক মিলে গাছের নীচ থেকে মানুষটিকে অনায়াসে বের করতে পারি।

বেশ কিছু ক্লার্ক মালিকে সমর্থন করে একসঙ্গে বলে উঠল, হাঁ, হাঁ, মালি ঠিক বলেছে। আমরা তৈরী, হাত লাগাও।

অনেকে গাছটিকে সরানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুপারিনটেনডেণ্ট হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আণ্ডার সেক্রেটারির কাছে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

সুপারিনটেনডেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারির কাছে গেলেন। আণ্ডার সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে গেলেন। ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েণ্ট সেক্রেটারির কাছে গেলেন। জয়েণ্ট সেক্রেটারি চীফ সেক্রেটারির কাছে গেলেন। চীফ সেক্রেটারি মিনিস্টারের কাছে গেলেন। মিনিস্টার চীফ সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। চীফ সেক্রেটারি জয়েণ্ট সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। জয়েণ্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। ডেপুটি সেক্রেটারী আণ্ডার সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। ফাইল চলতে লাগল —এর মধ্যে অর্দ্ধেক দিনও চলে গেল।

দুপুরের লাঞ্চের পর সেই চাপা-পড়া মানুষের চারদিকে আরো ভীড় বেড়ে গেল। নানা মানুষ নানা ধরনের কথা বলতে লাগল। কিছু বিজ্ঞ ক্লার্ক নিজেরাই সমস্যার সমাধান বের করে ফেলল। বিনা হুকুমেই তারা যখন গাছ সরানোর পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই সুপারিনটেনডেণ্ট ফাইল নিয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন। বললেন, আমরা এই গাছ আমাদের খেয়াল খুশী মতো এখান থেকে সরাতে পারব না। কারণ আমরা বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, আর এই গাছ কৃষি দপ্তরের এক্তিয়ারে। আমি এই ফাইল আর্জেণ্ট মার্ক করে এখনই কৃষি দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখান থেকে উত্তর আসার পর আমরা গাছ সরাবো।

দ্বিতীয়দিন কৃষিবিভাগ থেকে উত্তর এলো, এই গাছ বাণিজ্য দপ্তরের লনে পড়েছে, সুতরাং এই গাছ সরানোর দায়িত্ব বাণিজ্য দপ্তরের।

উত্তর পড়ে বাণিজ্য দপ্তর যারপরনাই চটে গেল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে কড়া জবাব দিল, এই গাছ সরানো বা না সরানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষি দপ্তরের। বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

পরের দিনও ফাইল চলতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যার সময় জবাব এল, আমরা এই সমস্যা হর্টিকালচার ডিপার্টমেণ্টে পাঠালাম। কারণ এ এক ফলদার গাছের ব্যাপার। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট শাকসব্জি এবং খেত-খামার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। জামগাছ ফল দেয়। সুতরাং এই ধরনের ফলদার গাছের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে হর্টিকালচার ডিপার্টমেণ্টেরই অন্তর্গত।

রাত্রে মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে ডাল-ভাত খাওয়ালো। তার চারদিকে পুলিশের কড়া পাহারা বসেছে, কোন মানুষ যেন নিজের হাতে কানুন তুলে নিয়ে গাছ সরানোর চেষ্টা না করে। কিন্তু একজন পুলিশের চাপা-পড়া মানুষটির প্রতি করুণা হয়। সে মালিকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়।

মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল, তোমার ফাইল চলছে, মনে হচ্ছে কালকের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া মানুষটি মালির কথার কোন জবাব দেয় না।

মালি গাছটির দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, ভাগ্যিস গাছটা তোমার কোমরের একদিকে পড়েছে, কোমরের মাঝখানে পড়লে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যেত।

চাপা-পড়া মানুষ কিন্তু মালির কথার কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে না।

মালি আবার বলল, তোমার যদি কোন ওয়ারিস থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা বল, আমি তাকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।

চাপা-পড়া মানুষটি অনেক কষ্টে মালিকে বলল, আমি নিজেই বেওয়ারিস।

মালি দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল।

তৃতীয়দিন হর্টিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট খুব কড়া এবং ব্যঙ্গপূর্ণ জবাব দিল। হর্টিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহিত্য দরদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ভাষায় লিখলেন, খুব আশ্চর্যের কথা যখন সমগ্র দেশে আমরা বৃক্ষ রোপণ করছি, তখনই আমাদের দেশে এমন কী সরকারী আইন আছে যার বলে বৃক্ষ কাটা যায়! বিশেষ করে এমন এক বৃক্ষ —যা ফল দেয়। আর এই বৃক্ষ হচ্ছে একটি জাম বৃক্ষ, যার ফল সবাই আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করে। আমাদের বিভাগ কোন মতেই এই ধরনের এক ফলদার বৃক্ষকে কাটার অনুমতি দিতে পারে না।

একজন রসিক মানুষ আফসোস করে বলল, এখন তবে কি করা যায়? যদি গাছ কাটা না যায় তবে মানুষটিকেই কেটে বের করা হোক। সে সবাইকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে দিল, দেখুন, যদি মানুষটিকে এখান থেকে কাটা যায় তবে অর্ধেক মানুষ এদিকে বেরিয়ে আসবে, অর্ধেক ঐদিকে। আর গাছটিও যেমনকে তেমন থাকবে।

চাপা-পড়া মানুষটি তার কথার প্রতিবাদ করে উঠল, কিন্তু আমি যে মারা যাব।

একজন ক্লার্ক বলল, হাঁ, এ কথাও ঠিক।

মানুষটিকে কাটার জন্য যিনি নিপুণ যুক্তি হাজির করছিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনি জানেন না, আজকাল প্লাস্টিক সার্জারি কত উন্নতি সাধন করেছে। একে যদি দুখণ্ড করে কেটে বের করা যায় তবে প্লাস্টিক সার্জারি করে আবার জোড়া লাগানো যাবে।

এইবার ফাইল মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হল। মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশন নিল। যেদিন তাদের ডিপার্টমেণ্টে ফাইল পৌঁছল তার পরদিনই তারা ঐ ডিপার্টমেণ্টের যোগ্যতম প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে পাঠিয়ে দিল। সার্জেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাপা-পড়া মানুষটির স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্ট এবং লাংস পরীক্ষা করে এক রিপোর্ট লিখলেন। হাঁ, প্লাস্টিক অপারেশন হতে পারে এবং অপারেশন সফলও হবে, তবে মানুষটি মারা যাবে।

সুতরাং এই ফয়সালাও আর গ্রহণ করা হল না।

রাত্রে মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে খিচুরি খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, তোমার ব্যাপারটি ওপর মহলে গিয়েছে। শুনেছি কালকে সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত সেক্রেটারিদের মিটিং হবে। ঐ মিটিং-এ তোমার কেস রাখা হবে। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া মানুষটি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল,

জানি আমাকে হয়তো অস্বীকার করবে না
কিন্তু তোমার কাছে যখন খবর আসবে
তখন আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

মালি আচমকা তার ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে আশ্চর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি···তুমি কি কবি?

চাপা-পড়া মানুষটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

পরের দিন মালি চাপরাসিকে বলল, চাপরাসি ক্লার্ককে বলল, ক্লার্ক হেডক্লার্ককে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা সেক্রেটারিয়েটে খবর রটে গেল চাপা-পড়া মানুষটি একজন কবি। আর দেখতে দেখতে কবিকে দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়ল। এই খবর শহরেও পৌঁছে গেল। আর সন্ধ্যার মধ্যে শহরের অলি-গলিতে যত কবি আছেন তাঁরা এসে জমা হলেন। সেক্রেটারিয়েটের লন কবি, কবি আর কবিতে ভরে উঠল। চাপা-পড়া মানুষটির চারদিকে কবি সম্মেলনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। সেক্রেটারিয়েটের কয়েকজন ক্লার্ক এবং আণ্ডার সেক্রেটারি—যাঁরা সাহিত্য এবং কবিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাও এখানে এসে থেমে গেলেন। কয়েকজন কবি চাপা-পড়া মানুষটিকে তাদের কবিতা এবং দোহা শোনাতে শুরু করলেন। আর কয়েকজন ক্লার্ক তাকে তার নিজস্ব কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বললেন।

চাপা-পড়া মানুষটি যে একজন কবি, এই খবর যখন সেক্রেটারিয়েটের সাব কমিটিতে পৌঁছল, তখন তাঁরা রায় দিলেন; চাপা-পড়া মানুষটি একজন কবি, সুতরাং তার ব্যাপার ফয়সালা করতে হর্টিকালচার বা এগ্রি-কালচার দপ্তর পারে না। এ সম্পূর্ণভাবে কালচারাল বিভাগের ব্যাপার। কালচারাল বিভাগকে অনুরোধ করা হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভাগা কবিকে চাপা-পড়া ফলদার গাছ থেকে মুক্ত করা হোক।

ফাইল কালচারাল ডিপার্টমেন্টের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগ ঘুরতে ঘুরতে সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারির হাতে এল। বেচারা সেক্রেটারি ঠিক ঐ সময়েই গাড়িতে করে সেক্রেটারিয়েটে এসে পৌঁছলেন এবং তিনি চাপা-পড়া মানুষটির ইণ্টারভিউ নিতে শুরু করলেন।

—তুমি কবি?

সে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ।

—কোন্ নামে তুমি পরিচিত।

—ওস।

—ওস? সেক্রেটারি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। তুমি সেই ওস—যার পদ্য সংগ্রহ 'ওসের ফুল' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

চাপা-পড়া মানুষটি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, হাঁ।

সেক্রেটারি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের একাডেমির মেম্বার?

—না।

সেক্রেটারি বললেন, আশ্চর্যের কথা। এতো বড় কবি—'ওসের ফুলে'র লেখক আমাদের একাডেমির সদস্য নয়। আহা কী ভুল হয়ে গিয়েছে আমার, কতো বড় কবি, অথচ কী অন্ধকারের নীচে নাম চাপা পড়ে আছে।

—আজ্ঞে, নাম চাপা পড়ে নেই। আমি স্বয়ং এক গাছের নীচে চাপা পড়ে আছি। দয়া করে আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করুন।

'এক্ষুনি করছি' বলে সেক্রেটারি তখনই নিজের দপ্তরে রিপোর্ট করলেন।

পরের দিন সেক্রেটারি ছুটতে ছুটতে কবির কাছে এলেন। বললেন, নমস্কার, মিষ্টি খাওয়াও। আমাদের সাহিত্য একাডেমি তোমাকে কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য করে নিয়েছে। এই নাও তোমার সদস্য পত্র।

চাপা-পড়া মানুষটি বেশ কঠোরতার সঙ্গে তাকে বলল, 'আমাকে তো আগে এই গাছের নীচ থেকে বের করুন।' খুব ধীরে ধীরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব কঠিন অসুখ আর দুঃখের মধ্যে পড়েছে।

সেক্রেটারি বললেন, এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। আমি যা করতে পারি তা করে দিয়েছি। তুমি যদি মারা যাও তবে তোমার স্ত্রীকে পেনসন দিতে পারি। তবে আবেদন করলে তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কবি থেমে থেমে বলল, আমি বেঁচে আছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

সরকারের সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, মুশকিল কি জান, আমার দপ্তর শুধুমাত্র কালচারের সঙ্গে যুক্ত। গাছ কাটা কাটির ব্যাপার তো আর দোয়াত-কলমে হয় না—কুড়ুল-কাটারির সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে আর্জেণ্ট লিখে দিয়েছি।

সন্ধ্যার সময় মালি এসে চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল, কাল ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক এসে গাছ কেটে দেবে, আর তুমিও বেঁচে যাবে।

মালি খুব খুশী ছিল। চাপা-পড়া মানুষটির শরীরে আর কুলাচ্ছিল না। বাঁচার জন্যে আপ্রাণ সে যুঝে চলেছিল। কাল পর্যন্ত···কাল ভোর পর্যন্ত···যে কোন ভাবেই হোক কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে।

পরের দিন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের মানুষ জন যখন কুড়ুল-কাটারি নিয়ে গাছ কাটতে হাজির হল, তখন বৈদেশিক দপ্তর থেকে খবর এল, গাছ কাটা বন্ধ রাখ। কারণ দশ বৎসর আগে পিটোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী সেক্রে-

টারিয়েটের লনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন যদি এই গাছ কাটা হয় তবে পিটোনিয়া সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

একজন ক্লার্ক চিৎকার করে বলল, কিন্তু একজন মানুষের জীবনের প্রশ্ন যে জড়িত!

আর একজন ক্লার্ক অন্য ক্লার্কটিকে বলল, আরে এ যে দু' দেশের সম্পর্কেরও প্রশ্ন। তুমি কি জান না পিটোনিয়া সরকার আমাদের দেশকে কিভাবে সহযোগিতা করছে। আমরা কি বন্ধুত্বের জন্যে একজন মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে পারি না।

—কবির মরে যাওয়া উচিত।

—নিশ্চয়ই।

আণ্ডার সেক্রেটারি সুপারিনটেনডেণ্টকে বললেন, আজ প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ করে ফিরেছেন। বিকেল চারটায় বৈদেশিক দপ্তর এই গাছ সম্পর্কিত ফাইল তাঁর কাছে পেশ করবেন। উনি যা বলবেন তাই-ই হবে।

বিকেল পাঁচটায় সেক্রেটারি স্বয়ং ফাইল নিয়ে হাজির হলেন। এই যে শুনছো। খুশীতে গদ-গদ তিনি ফাইল দোলাতে দোলাতে বললেন, প্রধানমন্ত্রী এই গাছ কাটার হুকুম দিয়েছেন। সমস্ত আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কালই এই গাছ কাটা হবে। আর তুমিও এই সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে। আরে শুনছো কী। আজ তোমার ফাইল পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কবির হাত ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখের তারা স্থির এবং আর একসার পিঁপড়ে তার মুখের ভিতর ঢুকছিল।

তার জীবনের ফাইলও পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মহেঞ্জোদড়োর খাজাঞ্চীখানা

মহেঞ্জোদড়োর সব টিলাই খনন করা হয়ে গিয়েছে, মাত্র আর একটি-ই বাকী আছে। মহেঞ্জোদড়োর টিলা খনন করে মানুষ পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত উপাদানই দু হাতে লুণ্ঠন করে নিয়েছে।

কলসি, খেলনার জিনিস, স্নানাগার, চাকি, আস্তাবল, গুদাম, কাপড় রঙ-করার পাত্র, মাটির তাবুত*, দাঁড়িপাল্লা, সের, পোয়া, ছটাক খননকারীরা সব কিছুই বের করেছিল, কিন্তু তারা যা চাইছিল তার কিছুই পেল না।

খনন করা এবং অনুসন্ধানের যে সফলতা ও অসফলতা দু-ই ছিল অবশ্যম্ভাবী। খনন করার পর মাটি সমস্ত সম্পদই তুলে দেয়—কিন্তু মানুষ কখনো কখনো তার ইচ্ছাকে এই মাটির বুকে খনন করে এবং অসফলও থেকে যায়। তখন মাটিকে গালাগলি দেয়। হায় এর জন্যে মাটির কি অপরাধ?

মাটিতো মানুষের প্রতিটি ইচ্ছাকেই পূরণ করে, কিন্তু সেই ইচ্ছা সে পূরণ করে তার নিজস্ব কায়দায়। বস্তুতঃ পৃথিবী এক বিলোল প্রেমিক—অজস্র মানুষ তাকে নিছক মাটি বলেই মনে করে। আর সেই ভাবেই সে তার ইচ্ছাকে মাটির সঙ্গে বিলীন করে দেয়।

ইঞ্জিনিয়ার আর পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সভা চলছিল। এঁদের মধ্যে টাক মাথাওয়ালা একজন ইউরোপিয়ান ছিলেন। নাম তাঁর ডেভিড। তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং ইহুদি। দ্বিতীয়জন ছিলেন শ্যামবর্ণ, একহারা, মুসলমান—নাম তাঁর আতাহর। সব সময় মাটির কীলক সংগ্রহ করার তাঁর খুব সখ ছিল। (মাটির গভীর থেকে তোলার সময় যদি কোন কীলক বা শিলমোহর ভেঙ্গে যেত, তবে তাঁর চোখ জলে এমন ভরে উঠত, যেন কেউ তাঁর হৃদয়ে পা রেখেছে।) তৃতীয়জন ছিলেন একজন বাঙ্গালী হিন্দু—মজুমদার। তাঁর গায়ের রঙ ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিদৃপ্ত ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। শেষ মমি তাঁর সামনেই খোলা হয়েছিল। ফরাতের জল

* তাবুত: মৃত মানুষকে বহন করার খাটিয়া।

বসতিতে নেনোয়ার রাণীর কবরখানা উনিই খুঁজে বের করেছিলেন। চতুর্থজন ছিলাম আমি স্বয়ং। আমি ছিলাম অতীত যুগের পরিতাপ এবং অনাগত যুগের গুঞ্জন। এরা শুধু আমার কথাই শুনতে পায়, কিন্তু আমাকে দেখতে পায় না।

মজুমদার বললেন, মাত্র আর একটিই টিলা খোঁড়া বাকী আছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এতো বড় শহরের খাজাঞ্চীখানার কি হল? মেয়েদের সোনার গহনা কোথাও কোথাও পাওয়া গিয়েছে সত্য, কিন্তু তা নেহাতই সাধারণ। এর মধ্যে অবশ্য কোন কোনটায় হীরা-জহরতও বসানো আছে—তবে তা সাধারণ, ছোট এবং নিম্নমানের। এর থেকে এই প্রমাণিত হচ্ছে সে যুগে সোনার আবিষ্কার হয়েছিল—হীরা-জহরতেরও। কিন্তু শহরের খাজাঞ্চীখানা কোথায় গেল?

আমি বললাম, হতে পারে আজকের মতো কোন নাদির শাহ সেই জামানাতেও ছিল। আর সে এই শহরের সমস্ত খাজাঞ্চীখানা লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

তাঁরা আমার কথার কোন পরোয়াই করল না।

আতাহর বললেন, অগণিত অসংখ্য কীলক পাওয়া গিয়েছে সত্য, কিন্তু কোন টিলাতে এমন একটিও শিলমোহর পাওয়া গেল না যা থেকে মহেঞ্জোদড়োর ভাষার চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায়। এই চাবিকাঠি না পাওয়া গেলে আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষার বাহক সেই অমূল্য সত্যতা থেকে আমরা বঞ্চিত থাকব।

আমি বললাম, এই যে মৃত-ভাষার খোঁজনেওয়ালার দল, আজ যে তোমাদের সামনে জীবন্ত-ভাষার গলা কাটা যাচ্ছে।

কিন্তু আতাহর এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন যেন আমার কোন কথাই তাঁর কানে গেল না।

ডেভিড বললেন, খাজাঞ্চীখানা পাওয়া না গেলেও আমি কোন পরোয়া করি না। কোন্ খাজাঞ্চীখানা আমরা ঘরে নিয়ে যাব? ভাষার চাবিকাঠি না পাওয়া গেলেই বা কি আসে যায়? আজ এ কোন কাজে আসবে? নিজের বাচ্চ-বাচ্চাদের তো আর এই ভাষায় তালিম দিতে পারব না। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এতো বড় বড় টিলা খুঁড়েছি, খুঁড়ে সারা মহেঞ্জোদড়োর বুনিয়াদকে নাড়িয়ে দিয়েছি, তবু মাটির খোদা পাইনি—যে খোদাকে এরা পূজা করত। প্রতিটি সভ্যতার কোন না কোন দেবতার কল্পনা অবশ্যই থাকে। কিন্তু

মহেঞ্জোদড়োর বাসিন্দারা কোন্ দেবতার উপাসনা করত, কোন টিলা খুঁড়ে এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

আমি বললাম, এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কোন টিলা খোঁড়ার প্রয়োজন নেই। নিজের দিলকে একটু খুঁড়লেই চলবে।

ডেভিড রাগে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হল এক মাকড়সার জালে আমি লটকে আছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দরজার বাইরে তাকালেন।

বাইরে ধূ ধূ বালিতে এক বৃদ্ধ ভেড়া চড়াচ্ছিল।

ডেভিড বললেন, একদিন এই বৃদ্ধ মেষ পালক আমাকে বলেছিল মহেঞ্জোদড়োর সবচেয়ে মূল্যবান রহস্য ঐ বড় টিলার নীচে লুকানো আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ টিলা যা তোমরা এখনো খোঁড়নি?

তাঁরা কেউই আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। সবাই নিজের নিজের স্বপ্নে হারিয়ে গেলেন।

ডেভিড হঠাৎ বললেন, আগামীকাল রাত্রে মজুররা যখন তাদের কাজ শেষ করে নিজের ঘরে চলে যাবে তখন আমরা তিন জন মহেঞ্জোদড়োর এই শেষ টিলা খুঁড়বো।

আতাহর বললেন, মনে হয় মহেঞ্জোদড়োর খাজাঞ্চীখানার চাবিকাঠি পাওয়া যেতে পারে।

মজুমদার বললেন, হয়তো মহেঞ্জোদড়োর খাজাঞ্চীখানাও পাওয়া যেতে পারে।

ডেভিড বললেন, হয়তো বা মহেঞ্জোদড়োর খোদাও পাওয়া যেতে পারে।

তিন জনেই সেই উঁচু টিলার দিকে তাকালেন। টিলার খুব কাছেই সেই মেষ পালক ভেড়া আর বকরী চরাচ্ছিল। আমার যেন হঠাৎ মনে হল সে মুচকি মুচকি হাসছে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তিনজন মাটি খুঁড়তে লাগলেন। মাটি নরম আর বালিতে ভর্তি ছিল। যত উঁচু টিলা ততই বালিতে পরিপূর্ণ। এ পর্যন্ত ঐ টিলা থেকে কাজের কোন জিনিসই বের হয়নি। মাটির একটি কীলক, বাচ্চাদের একটি খেলনা, মেয়েদের একটি গহনা আর মৃতের একটি তাবুত শুধু বের হয়েছে। আর কিছুই এই টিলা থেকে বের হয়নি। শুধু বালি আর বালি।

ডেভিড ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, মেষ পালকটা ফালতু কথা বলেছে।

মজুমদার বললেন, মূল্যবান জিনিস সব শেষেই পাওয়া যায়। মানব প্রকৃতিই এই, সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস সে খুব সুরক্ষিত জায়গায় রাখে।

আতাহর তাঁর কপালের ঘাম মুছে, কোমর টান করে বললেন, আমরা এখন টিলার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বালি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। কণ্ঠস্বরে তাঁর খুব নৈরাশ্য ছিল।

আমি বললাম, পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন বালুকা রাশিকে তো দেখো। এর প্রতিটি কণায় কণায় কত পুরানো কাহিনী জড়িয়ে আছে। এই বালি দিয়ে একদিন বেলোয়াড়ি চুড়ি বানানো হয়েছে। আর সেই চুড়ি মহেঞ্জোদড়োর মেয়েরা তাদের নরম নরম হাতে পরেছে। এই বালি দিয়ে মহেঞ্জোদড়োর ছোট ছোট শিশুরা বালির খেলা-ঘর বানিয়েছে। এই বালিতেই আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর আগে কোন প্রেমিকের মৃতদেহকে দফন করা হয়েছে। এই বালির একটু ঘ্রান নাও। শোন পাঁচ হাজার বৎসরের পুরানো গন্ধ কি বলছে? কি, কি শুনছো? কি, কি ফরিয়াদ করছে?

ঠিক এই মুহূর্তে মজুমদারের কোদাল ধাতুর কোন পাত্রের গায়ে আঘাত করে বেজে উঠল। মজুমদার কোদাল ফেলে দিয়ে ঐখানেই বসে পড়লেন। তাঁর হৃদপিণ্ড দ্রুত চলতে লাগল।

ডেভিড মজুমদারকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'সামলিয়ে সামলিয়ে।' তারপর তিনি নিজেই তাঁর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন।

অন্যদিক থেকে আতাহর এসে তাঁর সামনে বসে পড়লেন।

আর একদিক থেকে ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছিল।

তাঁরা তিনজন হাত দিয়ে, এমন কি নখ দিয়েও আঁচড়িয়ে ধাতুর পাত্রটি বের করে আনলেন।

ডেভিড পাত্রটিকে ঝেড়ে-পুছে তাঁর হাতের ওপর উঠিয়ে গ্যাসের আলোতে দেখতে লাগলেন।

মজুমদার আনন্দে চীৎকার করে বললেন, এতো সোনার সিন্দুক।

সত্যিই এ ছিল সোনার এক সুন্দর সিন্দুক। আর এই সিন্দুকের ওপর ছিল অপরূপ কারুকার্য। মহেঞ্জোদড়োর প্রাচীন ভাষাও এর ওপর খোদিত ছিল। আর ছিল খোদিত এক অদ্ভুত দেবতার প্রতিমূর্তি।

মজুমদার চীৎকার করে বললেন, এটিই হচ্ছে মহেঞ্জোদড়োর অমূল্য সম্পদ—নীলা, পান্না আর হীরায় ভর্তি।

আতাহর বললেন, এতে মহেঞ্জোদড়োর ভাষার চাবিকাঠিও আছে। বাইরের এই খোদাই-করা হরফগুলি দেখো।

ডেভিড বললেন, এর মধ্যে মহেঞ্জোড়োর খোদা আছে। অদ্ভুত সব দেব-দেবীর মূর্তি এই পবিত্র সিন্দুকটিকে রক্ষা করছে। এই দেখো, এই দেখো।

মজুমদার করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, খোল, খোল, তাড়াতাড়ি এই সিন্দুক খোল।

সিন্দুকেও সোনার তালা লাগানো ছিল। কিন্তু তালা খুলতে ডেভিডকে তেমন কোন বেগ পেতে হল না। পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ আর সিঁধেল চোরদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কৌশলতায় দুজনের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল আছে। তাই তালা খুব তাড়াতাড়ি খুলে গেল। কিন্তু ঢাকনা খোলার সময় ডেভিডের হৃদপিণ্ড ধক ধক করে উঠল। শেষ মুহূর্তে এই রকমই হয়—যেন থিয়েটারের পর্দা তোলা হচ্ছে।

মজুমদার বললেন, ঢাকনা খোল, তাড়াতাড়ি ঢাকনা খোল।

ডেভিডের হৃদয় আবার কাঁপতে লাগল।

আতাহর এগিয়ে এসে সিন্দুকের ঢাকনা এক ঝটকায় টেনে খুলে ফেললেন। ভিতরে গোল গোল কি একটা কালো জিনিস পড়েছিল। ডেভিড খুব সাবধানে তা তুলে নিলেন। ঘ্রান নিয়ে খুব নৈরাশ্যের সঙ্গে বললেন, এতো একটি রুটি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, রুটি। (রুটিই তো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।)

মজুমদার হতাশায় চীৎকার করে উঠলেন, রুটি।

আতাহর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, রুটি।

আমি বললাম, (সমস্ত ভাষারই চাবিকাঠি এই রুটি।)

ডেভিডের মাথা নিরাশায় তার বুকের সামনে ঝুকে পড়েছিল। তিনি খুব ধীরে ধীরে বললেন, শুধু মাত্র একটি রুটি।

আমি বললাম, রুটি, রুটিই তো সারা সভ্যতার খোদা।

কিন্তু আশা আর নিরাশার প্রথম টানা-পোড়েনে ওঁরা কেউই আমার কথা বুঝতে পারলেন না। তাঁরা তিনজন বারবার রুটি তুলে দেখতে লাগলেন। হ্যাঁ, রুটি, আনাজের তৈরী রুটি। আগুনে সেঁকা রুটি। আর কেবলমাত্র একটিই রুটি।

ডেভিড রুটিটি হাতে তুলে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, কোথায় সেই মেষ চালক, যে বলেছিল মহেঞ্জোদড়োর শেষ টিলার নীচে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লুকানো আছে।

তিন জনেই একসঙ্গে যেখানে মেষ চালক ভেড়া আর বকরী চরাচ্ছিল সেই দিকে তাকালেন। আমার মনে হল মেষ চালক যেন হাসছে। পর মুহূর্তেই মনে হল এই রুটির জন্যে সে যেন অবিশ্রাম কেঁদে চলেছে—যে রুটিই হচ্ছে মানুষের প্রথম আনন্দ আর শেষ দুঃখ। আমার হঠাৎ আবার মনে হল মেষ চালক যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্রুশ। আর ক্রুশের পেছনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সূর্য। সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে সেই রুটি সোনার থালার মতো ঝকঝক করে উঠল। তিন জনেই যেন হঠাৎ কিছু অনুভব করতে পারলেন। মজুমদার ডেভিডকে ইশারায় কিছু দেখিয়ে বললেন, লুকিয়ে ফেলো, রুটিটাকে লুকিয়ে ফেলো, মজুররা কাছে আসছে।

ডেভিড ঘাবড়িয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর জামার নীচে রুটিটা লুকিয়ে নিয়ে পূব আকাশের দিকে তাকালেন।

অরুণোদয় বলতে যা বোঝায় এখন ঠিক তাই। ভোরের সূর্যের উজ্জ্বলচ্ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মজুররা কোদাল উঠিয়ে তাদের কাজে আবার ফিরে আসছিল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার

চার নম্বর আদালত কক্ষে অভিযুক্ত, উকিল, মক্কেল, সাক্ষী আর মজা-দেখার জন্যে লোকের ভীড়ে গিজগিজ করছিল। সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল, কিন্তু বিচারকের আসন তখন পর্যন্ত শূন্য।

এই আদালতেই আজ ট্যাক্সি ড্রাইভার বিক্রমের এগারো দফা হাজিরা দেওয়ার দিন। গত চার মাস ধরে এই আদালতের সামনে তাকে এগারো বার পেশ করা হয়েছে, আর প্রতিবারই তার পেশ-হওয়ার তারিখ পিছিয়ে গিয়েছে। তার কেসও আর কোর্টে ওঠে না। গত চার মাস ধরে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আদালতে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং এই চার মাসে সে এগারো দিন গাড়ি চালাতে পারেনি। ট্যাক্সি চালাতে না পারলে বাড়ির খরচ-খরচা, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, মুদির কাছ থেকে জিনিস আনা চলে কী করে—চলে শুধু বৌয়ের মুখ।

খুব একটা জবরদস্ত মোকদ্দমা ওর ছিল না। শহরের সবচেয়ে একজন বড় লোকের কারের পাশ কাটিয়ে ও তীব্র বেগে বেরিয়ে যায় আর হাজার চেষ্টা সত্বেও ঐ গাড়িকে সে আগে বেরিয়ে যেতে দেয় না। আসলে বড়লোকের গাড়িকে সে তার আগে বেরুতে দেয়নি। বড়লোকের গাড়িটা তার পেটের মতোই বড়-সড় ছিল আর ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা। গাড়ির রঙ ছিল এক ছিনাল মেয়ে মানুষের মেক আপের মতো চটকদার। তা সত্বেও বিক্রমের ট্যাক্সি তাকে মাত দিয়েছিল। এতে বিক্রমের ট্যাক্সি থেকে তার হাতের কুশলতা ছিল অনেক বেশী। মেশিন তো মানুষের হাতেই চলে, কিন্তু বড় লোকেরা একথা হামেশাই ভুলে যায়। মামুলি এক ট্যাক্সিওয়ালার এই বেয়াদপিতে শহরের এই বড়লোক ভীষণ ক্ষেপে যান। পরবর্তী চৌকিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনি ট্যাক্সি ইনেসপেকটারের কাছে একগুঁয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের বিরুদ্ধে নালিশ করে দেন।

এই মামলায় খুব বেশী হলে বিক্রমের দশ টাকা জরিমানা হত। কিন্তু ঐ বড়লোক খুব ব্যস্ত-সমস্ত মানুষ ছিলেন। ফলে পেশ হওয়ার তারিখের

কোন দিনেই তিনি হাজির হতেন না। আর বিক্রমের আজ আদালতে হাজিরা দেওয়ার এগারো দিন।

ও বেশ ঘাবড়িয়ে তার উকিলকে জিজ্ঞেস করল, জজ সাহেব কি আজকেও আসবেন না।

বিক্রমের উকিল রুষ্টভাবে জবাব দিল, 'কি করে বলব?' কেননা বিক্রম তার উকিলকে প্রতি হাজিরার দিনে তিন টাকা করে দেওয়ার ওয়াদা করেছে। তার ধারণা সে খুব সস্তায় সওদা করেছে। বিক্রম ভেবেছিল বড়জোর দু-একবার হাজিরা দিলেই মামলা ফয়সালা হয়ে যাবে। ওর ধারণাই ছিল না মামলা এত দিন ধরে চলবে, আর তাকে তিন টাকার জায়গায় তেত্রিশ টাকা দিতে হবে। উকিল তাই এমন রূঢ়ভাবে তার কথার জবাব দিচ্ছে। তিন টাকার কেসকে এর চাইতে ভালো আর কি ভাবে জবাব দেওয়া যেতে পারে? বিশ-পঁচিশ টাকার মামলা হলে উকিলের মুখেও হাসি ফুটত। প্রতিটি উকিলেরই হাসি তার ছোট্ট ঠোঁটের নীচে চাপা থাকে। আর এই হাসি ফুটিয়ে তোলা এবং বের করার জন্যে আলাদা আলাদা মিটার আছে। কারো হাসি যদি পাঁচ টাকায় ফোটে, কারো হাসি ফোটে পঞ্চাশ টাকায়; কারো যদি ফোটে একশ টাকায়, কারো ফোটে হাজার টাকায়। উকিলের মিটার আর ট্যাক্সির মিটারের মধ্যে কোন ফারাক নেই। বিক্রম অধৈর্য হয়ে ভাবল এই জালিমকে আমি তেত্রিশ টাকা দিয়েছি। কিন্তু কোনদিন এ ভালো মুখে আমার সঙ্গে কথা বলেনি, কারণ আমি তিন টাকার মক্কেল। একে আমি কী বলব? জরিমানা তো আমার দশ টাকার বেশী হবে না, কিন্তু উকিলকে আমি তেত্রিশ টাকা দিয়ে দিয়েছি।

বিক্রম বেশ দীনতার ভাব নিয়ে উকিলকে বলল, পেস্কারের কাছ থেকে জেনে নিন না জজ সাহেব আজ আসবেন, না আসবেন না। আমার ট্যাক্সির লোকসান হচ্ছে।

উকিল ঘড়ি দেখে বলল, বাপস্ পোনে বারোটা হয়ে গিয়েছে। আমার মোকাদ্দমা দু নম্বর আদালতে আছে। ওখানে যাচ্ছি। তুমি এখানে আদালতে বসে থাক অথবা দাঁড়িয়ে থাক, কিন্তু এই আদালত ঘরেই থাকবে। তোমাকে যদি ডাকে তবে ছুটে আমাকে দু নম্বর আদালত থেকে ডেকে আনবে।

উকিল তার ফাটা কলার ঠিক করে ঢলঢলে প্যাণ্ট ল্যাগব্যাগ করতে করতে দু নম্বর আদালতের দিকে চলে গেল। একজন বড় এ্যাডভোকেটের

কুৎসিত মেয়েকে সে এই ভেবে বিয়ে করেছিল, যে। শ্বশুর জামাইকে এ্যাডভোকেট বানিয়ে দেবেন। কিন্তু বিয়ের ছ মাস পরেই ঐ বড় এ্যাডভোকেট মারা যান। আর গত সাত বছরে উকিল সাহেব সাত-সাতটি বাচ্চার বাপ হয়েছে। তাই তাঁর কোটের কলার ফেটে গিয়েছে।

দু নম্বর কোর্টের দিকে যেতে যেতে উকিল ভাবলেন, তিন টাকায় তুমি কী করতে পার। জীবনে যদি শুধুমাত্র রূঢ়তা আর রূঢ়তাই থাকে, তবে মুখে হাসি আসবে কোথা থেকে!

বিক্রম প্রথমে কোর্ট-রিডার্সের কাছ থেকে মহামান্য আদালত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করল। কিন্তু কোর্ট-রিডার্স যখন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল তখন ও ভয়ে সরে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের সুন্দর আর মোলায়েম দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। ওর দাড়ি খুব সুন্দর এবং ছোট-ছোট ছিল। আর ওর চোখ ছিল বেশ বড় বড়। ওদের খানদানীর সমস্ত পুরুষদের চোখ সুন্দর। ছোট-ছোট সুন্দর দাড়ি আর মাথায় বড় বড় জটা রাখে—রেশম গুচ্ছের মতো মসৃণ জটা। জট-পাকানো এই এক গুচ্ছ চুল ওদের ধর্ম আর সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের দাবীদার। বিক্রমের খানদানীতে অনেক জ্ঞানী-গুনী এবং পণ্ডিত এসে-ছিলেন, কিন্তু জামানার বিপাকে আজ বিক্রম ট্যাক্সি চালাতে বাধ্য হয়েছে।

বিক্রম চারদিকে বিমর্ষভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আদালত কক্ষের বাম কোণের সামনা-সামনি দরজার কাছেই সে জজ সাহেবের আর্দালিকে দেখতে পেল। ও ছিল মহামান্য জজ সাহেবের খাস আর্দালি। জজ সাহেব তাঁর প্রাইভেট ঘর থেকে বেরিয়ে যখন আদালত কক্ষে ঢোকেন তখন ঐ আর্দালি তাঁর আগে দু কদম এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে, যেন ভর্তি আদালতের এক দিক থেকে তাঁর আগমন বার্তা ঘোষিত করা হচ্ছে। আর জজ সাহেব কালো চশমা, কালো গাউন এবং সাদা রঙের প্রস্ফুটিত কলার পরে ভেতরে ঢোকেন। সমস্ত আদালত তখন তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ায়। আর যতক্ষণ না জজ সাহেব আদালতের উঁচু কুর্শীতে বসছেন ততক্ষণ ও দাঁড়িয়ে থাকে।

বিক্রম সবার দৃষ্টি বাঁচিয়ে জজ সাহেবের প্রাইভেট ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর্দালির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'জজ সাহেব কখন আসবেন?'

আর্দালি বলল, উনি তো ঠিক এগারোটার সময়েই এসে যান। জানি না আজ কেন দেরী করছেন। মনে হচ্ছে শরীর খারাপ হয়েছে।

'শরীর খারাপ হলে আদালত চলবে না ?'

'হ্যাঁ, চলবে।'

'অন্য কোন জজ সাহেব আসবেন ?'

'যখন একজন লম্বা ছুটি নেন, তখন কখনো কখনো আসেন। কিন্তু আজ কি হয়েছে, কে জানে! মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে জজ সাহেবের টেলিফোন আসবে।'

আর্দালির কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। আর্দালি টেলিফোন ধরার জন্যে জজ সাহেবের প্রাইভেট ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিক্রমও তার পেছনে পেছনে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরের একদিকে জজ সাহেবের খাওয়ার টেবিল, আর একদিকে আরাম কেদারা। কয়েকটা তেপায়া আর চেয়ারও ছিল। একটা আলমারিও ছিল ঘরে। সামনের দেয়ালের গায়ে তিনটে কীলক পোতা ছিল। একটা কীলকে জজ সাহেবের গাউন ঝুলছিল। টেবিলের ওপর ছিল কালো চশমা এবং কলার। আর একদিকে ছিল মাদ্রাসী পাগড়ী—এই পাগড়ী মাথায় দিয়ে তিনি আদালতে যান।

আর্দালি টেলিফোন রেখে বিক্রমের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'জজ সাহেব আজকে আসবেন না। উনার সর্দি হয়েছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল, তুমি ঘরের মধ্যে ঢুকেছ কেন? জান না এই ঘরে ঢোকা নিষেধ। বাইরে বেরিয়ে যাও।

আর্দালি রেগে বিক্রমের দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রম সঙ্গে সঙ্গে তার দৃঢ় হাত আর্দালির মুখের ওপর ঠেসে ধরল।

চার নম্বর আদালত কক্ষ তামাশা-দেখার লোক আর বাইরের উকিলে ভরে উঠেছিল, কেননা আজ বিচারকের চেয়ারে নতুন জজ বসে ছিলেন,—এর আগে তাঁকে কেউ দেখেনি। তামাশা দেখতে যারা এসেছিল তাদের চেয়ে উকিলরা তাঁকে দেখতে বেশী উৎসুক, কেননা নতুন জজ কি রকম রায় দেন আর আইন-কানুন সম্পর্কেই বা তিনি কতটুকু জ্ঞান রাখেন।

মামলার আসামী ছিল বালাচন্দ্রন। বালাচন্দ্রন তার বাড়ির একটি ঘর এক বৃদ্ধা এবং তার ছেলেকে ভাড়া দিয়েছিল। বৃদ্ধা এবং তার ছেলে সেই ঘরে আজ প্রায় দশ বৎসর ধরে আছে আর ঠিক সময় মতো ভাড়া দিয়ে এসেছে। কিন্তু বৃদ্ধার জোয়ান ছেলে কারখানার এক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে

মারা যায়। ফলে বৃদ্ধা ছ মাস ধরে ভাড়া দিতে পারছে না, আর বালাচন্দ্রন বৃদ্ধাকে ঘর থেকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে আদালতের হুকুমনামা চাইছিল।

জজ বালাচন্দ্রনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়িতে সবশুদ্ধ কটা ঘর ?

বালাচন্দ্রন জজকে বলল, দশটা ঘর আছে।

আর তোমার পরিবারে কজন লোক ?

'আমি একাই।'

'তোমার বয়স কত ?'

'সত্তর বছর, হুজুর।'

জজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধের দশ কামরার কি প্রয়োজন ?

'তুমি কি তোমার দশ কামরা থেকে একটা কামরা এই বৃদ্ধ মহিলাকে দিতে পার না—যার জোয়ান ছেলে ছ মাস হল কারখানায় মারা গিয়েছে।'

বালাচন্দ্রনের উকিল বলল, হুজুর, সেকশন নং ওমুক ওমুক, ওমুক ওমুক ধারার, ওমুক ওমুক কানুন বলে···

নতুন জজ গর্জে উঠলেন, আর মানবিকতা কি বলে ?

বালাচন্দ্রনের উকিল জজের গর্জনে বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

নতুন জজ মুচকি হেসে সত্তর বৎসরের দুর্বল এবং ক্ষীণ চেহারার বালাচন্দ্রনের দিকে তাকালেন। সত্তর বৎসর ধরে বালাচন্দ্রন যে কঞ্জুসি করে এসেছে সেই কঞ্জুসির অভাবী ছাপ তার চেহারার ওপর সুস্পষ্ট ছিল। সে তাঁর ঠোঁট এবং কপাল কুঁচকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নতুন জজ এক ঝলক হেসে বালাচন্দ্রনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়িতে কজন চাকর আছে ?

বালাচন্দ্রন বলল, একটিও নেই।

'তোমার কি নিজেকে একাকী মনে হয় না ?'

উকিল খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে জজের বিরোধিতা করতে চাইছিল। জজ এ ধরণের প্রশ্ন কেন করছে ? এই প্রশ্নের সঙ্গে মোকদ্দমার কি সম্পর্ক ? কিন্তু কোন কিছু বলা তার হিম্মতে কুলাল না।

'কখনো, কখনো একাকী মনে হয়।'

তোমার কি ইচ্ছে হয় না কেউ তোমার ঘর ঝাড় দিয়ে দেয়, তোমার জামা-কাপড় সময় মতো তোমার হাতে তুলে দেয়,—তোমার স্নানের জল রেখে দেয়, তোমার জন্যে খাবার তৈরী করে দেয়, আর রাত্রে তুমি যখন শুয়ে পড় তখন কেউ খুব আস্তে আস্তে তোমার পা টিপে দেয় ?

'হাঁ হুজুর, মন তো চায়!'

'আর কেউ যদি এই সব সেবার পরিবর্তে তোমার দশ কামরা থেকে মাত্র একটি কামরা থাকার জন্যে চায়, তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও না নেয়—শুধু একটি কামরা আর দু বেলা দু মুঠো খাওয়া—তবে তুমি কি তার আর্জি বাতিল করে দেবে?'

বালাচন্দ্রন নিরাশ হয়ে বলল, কিন্তু হুজুর, এমন মানুষ আজকাল দুনিয়াতে কোথায় আছে? সে জন্যেই তো আমি চাকর রাখিনি।

বৃদ্ধার মুখ হাসিতে ভরে উঠল। দু হাত প্রসারিত করে সে জজকে আশীর্বাদ করতে লাগল। তারপর সে বালাচন্দ্রনকে ধমক দিয়ে বলল, আরে, এখন ঘরে চল্, তোর খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধা বৃদ্ধের হাত তার মুঠিতে চেপে ধরল। সমস্ত আদালত হাসিতে ফেটে পড়ল। বালাচন্দ্রনের উকিল বালাচন্দ্রনকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করল, 'বালাচন্দ্রন তুমি ঘাবড়িও না, আমি এই ফয়সালার বিরুদ্ধে আপিল করব……।'

বালাচন্দ্রন বলল, 'তোমার কোন কিছু করার দরকার নেই। এই ফয়সালা আমি মেনে নিয়েছি।' সে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে হাসল, যেন সুখী ধরিত্রীর বুক থেকে নির্মল জলধারা উছলিয়ে পড়ছে।

আদালতের কাঠগড়ায় এক সুন্দরী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন ভাবে ও দাঁড়িয়ে ছিল যেন আদালতের কাঠগড়ায় ফুলদানিতে কেউ এক স্তবক ফুল রেখে দিয়েছে। তার হলদে ফ্রকের ওপর ছোপ-ছোপ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি উকিলের চোখে-মুখে হাসি এনে দিয়েছিল।

জজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাহলে তোমার স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইছ?

'জী, হাঁ।'

'কেন, তোমার স্বামী কি বেকার?'

'না, ও রেলে ইঞ্জিন ড্রাইভার।'

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, আর রুমাল দিয়ে বারবার তার ফর্সা মুখ মুছছিল। আজ তার খুব বে-ইজ্জতের দিন। আজকে যদি এই আদালত রেলগাড়ির কোন কামরা হত, তবে সে গোটা গাড়িটাকেই কোন খানা-খন্দরে ফেলে দিত।

'—তুমি এর সঙ্গে তালাক কেন চাইছ ?'

'—আমার মানুষের মুখ থেকে গন্ধ আসে।'

'—কি আসে ?'

'—প্রতিদিন রাত্রে খাবারের সঙ্গে রসুনের কোয়া ওর চাই-ই।'

'—তুমি ওকে রাত্রে টুথ ব্রাশ করতে বল না কেন ?'

'—আমি তো ওকে বলি, কিন্তু ও শোনে কোথায় ?'

'—তুমি শোয়ার আগে টুথ ব্রাশে টুথ পেস্ট লাগিয়ে যদি ওর মুখে দিয়ে দাও, তবে কি ও দাঁত সাফ না করে পারে ?'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। তারপর বলল, হুজুর, এই লোকটি প্রতিদিন রাত্রে জুতো পায়ে দিয়েই আমার বিছানায় শুয়ে পড়ে।

জজ সাহেব বললেন, তুমিও জুতো পড়ে শুয়ে পড়। খুব বেশী হলে দিনেই ওর আদত ঘুচে যাবে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটির উকিল বলল, কিন্তু ভারতীয় আইনের সেকশন নং ওমুক ওমুক ধারা এবং ওমুক ওমুক মুতাবিক যদি কোন স্বামী-স্ত্রী……

জজ উকিলকে ধমকিয়ে বললেন, তুমি চুপ কর, স্বামী-স্ত্রীর মামলার মধ্যে তুমি বলার কে ?

জজ টাইপিস্টকে তাঁর ফয়সালা লিখতে বললেন, লেখ, যদি স্বামী জুতো পরে বিছানায় শোয়ার চেষ্টা করে তবে স্ত্রীরও চপ্পল পরে শোয়ার পুরোমাত্রা হক আছে। কেস ডিসমিস।

এখন কাঠগড়ায় 'চারী টেক্সটাইল' মিলের মালিক কৃষ্ণমাচারী দাঁড়িয়ে ছিল। সে ছিল যেমন লম্বা তেমনি কালো। তার কানে সাদা হীরা ঝলমল করছিল। সাদা রেশমের জামা এবং ধুতি পরে থাকায় তাকে দেবতার মতো মনে হচ্ছিল—এমন এক দেবতার মতো মনে হচ্ছিল যে সদ্য মন্দির থেকে উঠে এসে আদালতে দাঁড়িয়েছে। তার লম্বা লম্বা নরম আঙুলগুলি কাঠগড়ার ওপর ছিল। আঙুলগুলি এমন এক মানুষের বলে মনে হচ্ছিল যে জীবনে নোট গোনা ছাড়া সেই আঙুল দিয়ে অন্য কোন কাজ করেনি। আদালতের কাঠগড়ায় সে বেশ নিশ্চিন্তে এবং আবেশে দাঁড়িয়ে ছিল।

জজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বীকার করছ তোমার মিলের শ্রমিক রেড্ডির হাত মেশিনে কেটে গিয়েছে ?

—'জী হ্যাঁ।'

আর তুমি স্বীকার করাসত্ত্বেও রেড্ডিকে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করছ ?

'—জী।'

'—কেন ?'

'কারণ রেড্ডির হাত তার গাফিলতির জন্যে কেটে গিয়েছে—সেরেফ নিজের গাফিলতির জন্যে। আমার মিলের মেশিন খারাপ নয়।'

—'আমার মিল ?···তোমার মিল কেমন করে হল ?'

—'হুজুর, আমি এর মালিক।'

—'তুমি এই মিলের মালিক হলে কেমন করে ?'

—'হুজুর, আমি এতে টাকা লাগিয়েছি—আজ পর্যন্ত সত্তর লাখ টাকা লাগিয়েছি।'

—'আর কত টাকা কামিয়েছ ?'

—'তিন কোটি চল্লিশ লাখ।'

—'যদি এই মিলে একজনও শ্রমিক কাজ না করত তবে তোমার কত টাকা মুনাফা হত ?'

—'তা কেমন করে হত হুজুর ? মিলে যদি মজুর কাজ না করে তবে মুনাফা আসবে কোত্থেকে ?'

—'তা হলে তুমি হলফ করছ, তোমার সত্তর লাখ টাকা সত্ত্বেও কোন উৎপাদন হত না, যতক্ষণ না তাতে মানুষের হাত লাগছে।'

কৃষ্ণমাচারী সঙ্কুচিত হয়ে বলল, এতো বিলকুল ঠিক হুজুর।

—যে হাত মুনাফা দেয় সেই হাতকে হকদার কেন ভাবছ না ? ওর হাত—তা গলতির জন্যেই হোক, তা তোমার বা ওরই জন্যে কেটে থাকুক, ঐ হাতের মালিককে জিন্দগীভর কেন পেনশন দেওয়া হবে না ?

—'কিন্তু এতো স্যোসালিজম।'

—'আমাদের সরকার তো স্যোসালিজমকে গ্রহণ করে নিয়েছে।'

উকিল প্রতিবাদ করে বলল, কিন্তু সেকশন নং ওমুক ওমুক, ওমুক ওমুক ধারা মুতাবিক মিল মালিকের আসল পরিচয়···

জজ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উকিলকে বললেন, 'প্রশংসাই যদি করতে হয় তবে কোন শরীফ মানুষের প্রশংসা কর।' তিনি টাইপিস্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ফয়সালা লেখ, কৃষ্ণমাচারী 'চারী মিলে' সত্তর লাখ টাকা লাগিয়ে তিন কোটি চল্লিশ লাখ টাকা ওসুল করেছে। লিহাজ সুদ-আসল সে তুলে নিয়েছে। লিহাজ আজ থেকে মিল আর তাঁর রইল না, এখন থেকে

মিলের মালিক তাঁরাই যারা এতদিন পর্যন্ত তাদের হাতের মেহনতী-পুঁজি এতে লাগিয়েছে—এবং এখনও লাগাচ্ছে। অথচ কৃষ্ণমাচারী এই মিলে নিজের হাত না লাগিয়ে শুধু মুনাফার দাবীদার হতে চায়; এই আদালত রায় দিচ্ছে মিলের মুনাফা থেকে রেড্ডি সারা জীবন পেনশন ভোগ করবে এবং কৃষ্ণমাচারীর দু হাত কেটে নেওয়া হবে, কারণ এই হাত কোন কাজ করে না।—আমাদের রাষ্ট্রে যে হাত কাজ করে শুধুমাত্র সে হাতেরই প্রয়োজন আছে।

রায় শুনে কৃষ্ণমাচারী চীৎকার করে উঠল, 'এ কী ফাজলামি!' উপস্থিত উকিলরা রাগে চীৎকার করতে লাগল, এ জজ না কোন পাগল।

নতুন জজ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক গরীব উকিল তার ছেঁড়া-ফাটা কলার সামলাতে সামলাতে আদালত কক্ষে প্রায় ছুটে এসে ঢুকল। ঢুকে বলতে লাগল, একে পাকড়াও, পাকড়াও, এ জজ না। এ আমার মক্কেল। বিক্রম ট্যাক্সিওয়ালা।...জজের চেয়ারে ও কেন বসে আছে?

দু নম্বর কোর্টে যখন বিক্রম ট্যাক্সিওয়ালাকে পেশ করা হল, তখন বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম?

—'বিক্রমাদিত্য।'

—'বয়স?'

—'দু হাজার বৎসর।'

—'কি কাজ কর?'

—'ট্যাক্সি চালাই।'

আদালত নম্বর দুই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অনারেবল আদালতে গরহাজির হয়ে বিচারকের আসনে বসে আদালতকে কেন অপমান করেছ?

সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে বিক্রম ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখতে লাগল। বিক্রম ট্যাক্সিওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ নীচের দিকে মাথা ঝুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে হঠাৎ মাথা তুলে বলল, হুজুর জিন্দগী ট্যাক্সির মতো তীব্র বেগে চলে, কিন্তু আইন এখনও ছেকড়া গাড়ির গতি নিয়ে চলেছে। সরকার, আমি বেকসুর। আমি আদালতের চেয়ারে বসিনি। শুধু এক্সেলরেটরের ওপর একটু পা রেখেছিলাম।

জজ রায় দিলেন, 'ছ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।' রায়ের পর দুজন সিপাই বিক্রমাদিত্যকে ধরে আদালতের বাইরে নিয়ে গেল।

মূর্তি জেগে উঠেছে

আজ যে কাহিনী আমি আপনাদের শোনাচ্ছি, গতকাল পর্যন্ত তা ঘটেনি। কাল রাত্রি দুটোর সময়ও এই কাহিনীর জন্মলাভের কোন সম্ভবনা ছিল না। রাত্রি দুটোর সময় যখন আমি ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, এবং কাহিনী না আসায় আমি তার খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে চৌপাটির দিকে গেলাম। এই সময় চারদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ ছিল, সমুদ্রের গর্জনও ততো ছিল না। সমুদ্র যেন বহু দূর দিগন্তের বুকের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছিল। আর সমুদ্রের কিনারে বালুকারাশি লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের পায়ের ছাপ বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যথায় আর্তনাদ করছিল। আমি এই অদ্ভুত পরিবেশে বেদনাকে অনুভব করতে করতে এগিয়ে চললাম। ঠিক সেই সময় আমি শুনলাম—

—'তিলক ভগবান।'

আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম, সামনে তিলক মহারাজের মূর্তি। তিনি এক অদ্ভুত মেজাজ এবং অভিমানে নিজের মাথায় একরাশ ধুলোবালির বোঝা নিয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে আমি এক ছায়া মূর্তি দেখলাম। কিন্তু তার মুখ খুব স্পষ্ট আমার নজরে এলো না, কারণ আমার দিকে সে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে এতটুকু অন্তত আন্দজে করতে পেরেছিলাম, সে ছিল মাঝারি বয়সের একজন মানুষ, বেঁটে-খাটো শ্যামবর্ণ—মারাঠী। তার জামা আর কাপড়ের জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া-ফাটা ছিল। তার পায়ে কোন জুতা ছিল না। পায়ে ছিল তার এক গভীর ক্ষত চিহ্ন। ওকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওর কথা শোনার জন্যে ঐখানেই আমি বালির ওপর শুয়ে পড়লাম। যাতে ও না বুঝতে পারে একজন মানুষ বালির ওপর শুয়ে আছে, ওর কথা শুনছে।

মানুষটি আবার বলল, তিলক মহারাজ!

তিলক ভগবানের মূর্তি বলল, বল, কি বলছ?

আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন পাথরের মূর্তি কী আবার কথা বলতে পারে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না. প্রতি ঘোর অমবস্যায়, —যখন

চারদিকে গভীর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ রাত্রি থাকে সেই সময় মূর্তি জেগে ওঠে। শুধু জাগেই না, কথাও বলে। তখন যদি কেউ ডাকে এবং কিছু জিজ্ঞেস করে তবে সে তার উত্তর দেয়। আপনারা বোধহয় এ সব জানেন না, কিন্তু আমি বহুদিন থেকে জানি। তবে আমি নিজে কোন দিন কথা বলিনি। প্রথম তো দুনিয়ার হাজার ঝঞ্ঝাটে এত ফুরসৎ কোথায় রাত্রি দুটোর সময় মূর্তির সঙ্গে কথা বলতে যাব। আর তা-ছাড়া বোম্বাই-এ যত মূর্তি আছে, সেই সব মূর্তি এত বড় বড় মানুষের যে, সেই সব ইজ্জতদার মানুষদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় তা আমার জানা নেই। না জানি কোন্ কথা তাঁদের খারাপ লাগে। স্বাধীনতার আগে ভয় ছিল বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে পুলিশ আবার গ্রেফতার না করে বসে—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে না জানি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কি পরিকল্পনা রচনা করছে। আর আজ আবার এ জন্যে গ্রেফতার না করে, দেখ এই লোকটি নিজের সরকারের বিরুদ্ধাচারণের জন্যে নিজের দেশের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের কাছে নালিশ করছে। এই সব ভাবনা-চিন্তা করে আমি আজ পর্যন্ত কোন লিডারের মূর্তির সঙ্গে কথা বলিনি। অন্ধকার রাত্রি এসেছে, আবার চলেও গিয়েছে। আজকেই প্রথম আমি আমার জীবনে দেখার সুযোগ পেলাম এক বাঘের মতো মানুষ তিলক ভগবানের মূর্তির সঙ্গে কথা বলছে! আমি বালির ওপর শুয়ে শুয়েই এগুতে লাগলাম। যাতে আমি খুব ভালোভাবে ওদের কথা শুনতে পাই।

মারঠী লোকটি তাঁকে বলছিল, আমার নাম উত্তমরাও খাণ্ডেকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আমার জন্ম।

তিলক মহারাজ বললেন, আমারও এ সময়েই জন্ম।

খাণ্ডেকার বলল, পুণার এক ইস্কুলের আমি শিক্ষক ছিলাম। ইতিহাস আমি খুব ভালোবাসতাম।

তিলক মহারাজ বললেন, ইতিহাস আমিও পছন্দ করতাম।

খাণ্ডেকার বলল, আপনি যখন আওয়াজ তুললেন—'স্বতন্ত্রতা আমাদের জন্মগত অধিকার' তখন আমি ইস্কুলের টিচার ছিলাম। আমি আপনার সমস্ত বই পড়ি, আপনার সমস্ত ভাষণ শুনি। আমি ছোটদের ইতিহাস পড়তাম। ইতিহাস পড়াতে পড়াতে আমার মনে নতুন নতুন চিন্তার জন্ম নিতে লাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা আমার মনকে তোলপাড় করতে লাগল। ছোটদের ইতিহাস আমি এক নতুন ঢং-এ পড়াতে লাগলাম। পড়াতে পড়াতে যখন আমি সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এলাম তখন···

'তখন, তখন কি হল ? তিলক মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমাকে তখন ইস্কুল থেকে বের করে দিল। অফিসাররা বলল, এ বিদ্রোহ ছিল—স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল না। তারা বলল, আমি মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্রকারী, আমি কিশোরদের স্বভাব খারাপ করছি, দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছি। ইস্কুল থেকে তাই আমাকে বের করে দেওয়া হল। আমার রুজি রোজগারের দরজা বন্ধ করে দিল।'

তিলক মহারাজ আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর তুমি কি করলে ?

—'আমি রোজগারের জন্য সমস্ত দরজাতেই, যে সব জায়গায় দেশভক্তির জন্যে রুটি পাব বলে আমার আশা ছিল ধর্ণা দিলাম। কিন্তু কোথাও কিছু হল না। এতে কারো কোন দোষ ছিল না। সরকারের আক্রোশ আমার ওপর এত ছিল যে কেউ আমাকে সাহায্য করতে চাইল না। আমি আবার দেশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রী মেয়েদের ইস্কুলে চাকরী নিল। কিন্তু যেবার আমি প্রথম জেলে গেলাম, সেবারই তার ঐ চাকরীও চলে গেল। আমার বাচ্চারা খিদের জ্বালায় শুকিয়ে গেল। আমার স্ত্রী তার বাবা-মার কাছে গেল। কিন্তু গ্রামের প্যাটেল তার মা-বাবাকে বলল, মেয়ে যদি তোমাদের ঘরে থাকে তবে তোমাদের ওপরও বিপদ নেমে আসবে। আমার স্ত্রীকে তার মা-বাবাও ঘর থেকে বের করে দিল; তখন তার বেঁচে থাকার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। ও বেশ্যাবৃত্তি করে দিন চালাতে পারত, কিন্তু ওর আত্মা তা চাইল না। নদীতে ডুবে ও আত্মহত্যা করল। জেল থেকে আমি যখন ছাড়া পেলাম; তখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমার ওপর তখন কোন বোঝা নেই। আমি কৃষকদের মধ্যে খাজনা বন্ধ করার জন্যে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। খাজনা বন্ধের আন্দোলন যখন শুরু হল তখন আমি চন্দনবাড়ি গ্রামে এই আন্দোলন চালাচ্ছিলাম। প্রথমে অফিসার, তারপর পুলিস এবং মিলিটারি এসে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল। আমি গ্রামের মানুষদের খাজনা দিতে নিষেধ করলাম। তারা আমাকে গুলি করল। আমি মারা গেলাম। এই ক্ষত চিহ্নগুলি দেখুন, আমার সারা শরীরে কমসে কম বিশটি গুলির চিহ্ন আছে।

তিলক মহারাজ বললেন, আমি খুব দুঃখিত। তোমার নাম কি বললে ?

—উত্তমরাও খাণ্ডেকার।

—এ নাম তো কখনও শুনিনি।

খাণ্ডেকার বলল, আমার নাম কেউ জানে না। আমার স্ত্রী যে নদীতে

ডুবে মরেছে তার নামও কেউ জানে না। আমার দুই বাচ্চা যারা উপোস করতে করতে মারা গিয়েছে, তাদের নামও কেউ জানে না। ইতিহাসের কোথাও আমার নাম নেই। পট্টাভি সিতারামাইয়া কংগ্রেসের যে ইতিহাস লেখেছেন তাতেও কোথাও আমার নাম নেই। এখন কোথাও—কোথাও আমার নাম নেই। পুণার মানুষ, গ্রামের মানুষ, সারা মহারাষ্ট্রের মানুষ আমাকে ভুলে গিয়েছে।

তিলক মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এখন তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?

—না, কোন অসুবিধা নয়, শুধু একটু আকাঙ্খা আছে। এই আকাঙ্খাটুকু পূরণ করার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

তিলক মহারজ বললেন, আমি কি করতে পারি? আমি তো পাথরের মূর্তি মাত্র।

খাণ্ডেকার বলল, হ্যাঁ, আমি এই-ই হতে চাই। পাথরের এক মূর্তি। মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি শুধু ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমিও আপনার মতো পাথরের মূর্তি হতে চাই। আমাকে একটু জায়গা দিন।

দেখলাম, ছায়া মূর্তি পাথরের চবুতরের ওপর উঠতে আরম্ভ করল।

তিলক মহারাজ বললেন, একি, একি করছ?

খাণ্ডেকার বলল, আমিও আপনার সঙ্গে দাঁড়াতে চাই, আমাকে একটু বিশ্রামের জন্য জায়গা দিন। আমি আপনার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। সারা জীবনভর শুধু হেঁটেই চলেছি! মৃত্যুর পরে কি আত্মার সম্পর্ক থাকে না?

তিলক মহারাজ বললেন, না, ভাই, তা বলছি না। এ জায়গা হচ্ছে আমার—এ চবুতর আমার, আর মূর্তি আমার।

খাণ্ডেকার তিলককে জিজ্ঞেস করল, তবে আমার জায়গা কোথায়? ইতিহাসে নেই, চৌপাটিতে নেই, মানুষের হৃদয়ে নেই—তবে আমি কোথায় যাব?

তিলক মহারাজ বললেন, মিউনিসিপালিটির কাছে যাও। ওরা তোমার মূর্তি বানিয়ে দেবে।

খাণ্ডেকার বলল, ওরা তো মানুষ। মানুষ আজকাল কোথায় হৃদয়ের আওয়াজ শুনতে পায়!

তিলক মহারাজ বললেন, তুমি এখন এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে

যাও। ঐ যে পুলিশের লোক আসছে, তোমাকে আবার গ্রেপ্তার করে না নেয়। হ্যাঁ শোন, এখানে নয়, অন্য কোথাও তোমার মূর্তি ভালো করে তৈরী করিও। আমার পায়ের নীচে উত্তপ্ত বালি আর মাথার ওপর আকাশ এবং রৌদ্র। রৌদ্রে আমার মাথা ব্যাথায় টনটন করে, সারা শরীর বেদনায় জর্জরিত হয়ে যায়। সারাদিন ধরে এখানে চলে তামাশা আর হৈহুলোড়। বেকুবরা দই-বড়ার চাট খেয়ে এঁটো পাতা আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। কোন ভালো জায়গায় নিজের মূর্তি বানিও, বুঝলে।

ছায়া-মূর্তি পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গেল। আমিও এক ঝটকায় উঠে পালালাম। পালিয়ে চার্চ গেট স্টেশনের কাছে এলাম। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে হকি গ্রাউণ্ডের কাছে এক বড় গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময় শুনলাম কে যেন বলছে,

—'গোখেল মহারাজ!'

আমি চকিতে ফিরে তাকালাম। সামনের চবুতরের ওপর গোখেল মহারাজের মূর্তি। গোখেল মহারাজ কোট-পাতলুন পরে আছেন। আর কোট পাতলুন-পরা একজন মানুষ ঐ চবুতরে ওঠার জন্যে চেষ্টা করছে। চবুতরে উঠে সে যখন এগিয়ে গেল তখন গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মূর্তি বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি এগুলে আমি পুলিশকে ডাকব।

—কেন?

—আমি জাতীয় মূর্তি। তুমি আমার বেইজ্জতি করছ।

—কোট-পাতলুন পরা লোকটি বলল, বন্ধু, তোমাকে বেইজ্জতি করছি না, তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

গোখেলের মূর্তি বলল, ঠিক আছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সম্মানের সঙ্গে কথা বল। তুমি কে?

কোট-পাতলুন পরা লোকটি বলল, আমার নাম কর্তার সিং সরাভা।

গোখেল তাকে বললেন, শিখ আর পাঞ্জাবী! তাই তুমি অসভ্যের মতো এগিয়ে আসছ। তুমি জান না আমি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম।

কর্তার সিং বলল, বন্ধু, ঐ আইন সভার প্রবক্তারাই আমাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। আর তুমি ঐ কাউন্সিলের কর্মকর্তা ছিলে।

গোখেল বললেন, এতে আমার কোন দোষ ছিল না। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী দেশের সেবা করেছি।

কর্তার সিং গোখেলকে জিজ্ঞেস করল, কখনও জেলে গিয়েছ?

—না।

—কখনও ভূখ হরতাল করেছ?

—না।

—জেলার আর ওয়ার্ডারদের কাছে কখনও পিটুনি খেয়েছ? তোমার পিঠে কি দগদগে ঘা হয়েছে, গরম লোহা দিয়ে কি তোমার মাংসকে কিমা বানিয়েছে? তুমি কি কখনও পিপাসার্ত হয়ে জলের জন্যে কাতরিয়েছ, আর বারবার চেয়েও এক বিন্দু জল পাওনি?

—না, এমন ধরণের পাগলামি অনুভব আমার কোনদিন হয়নি।

—'হাঁ, আমি এই অমর আনন্দের স্বাদ পেয়েছি।' বলে কর্তার সিং তার কোট আর জামা খুলে ফেলে দিল। আমি দেখলাম তার পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরছে, গরম লোহার দগদগে দাগ মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে! আর তার গলায় টাইয়ের মতো ঝুলছে ফাঁসির দড়ি।

গোখেল মহারাজ তার নাকের ওপর রুমাল চেপে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি?

—এ ফাঁসির দড়ি। এ দড়ি আজও আমি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। এ দড়ি যখন আমার গলায় পরানো হয় তখন আমি বয়সে তরুণ। আমার বুকে ছিল হিম্মত! আমি কলকাতা থেকে মিরাট এবং অমৃতসরে সেনা-বাহিনীর মধ্যে ঘুরছিলাম—যাতে তাদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে সংগঠিত করা যায়।

গোখেল বললেন, হিংসাত্মক কাজ আমার উদ্দেশ্যে নয়। আমি অহিংসায় বিশ্বাসী।

কর্তার সিং গোখেলের কথায় কান না দিয়ে বলল, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ সফল হয়নি, কারণ আমাদের আন্দোলন শক্তিশালী ছিল না। আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল, আর আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।

গোখেল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এখন তুমি কি চাও?

কর্তার সিং বলল, সামান্য একটু সরে দাঁড়াও, আমাকে এই চবুতরে দাঁড়ানোর জায়গা দাও। এই চবুতরে দাঁড়ানোর অধিকার আমারও আছে। পনেরোই আগস্ট যখন তোমার গলায় মালা পরানো হয়, তখন এই চবুতরের পাশে আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ আমার গলায় মালা দেয়নি, কেউ আমার ফাঁসির দড়ির দিকে, কিম্বা আমার পিঠের দগদগে ঘায়ের দিকেও ফিরে তাকায়নি। কেউ আমার এ দেহের দিকে তাকায়নি—যে দেহ পেটে

খিদের জ্বালা নিয়ে স্বাধীনতার গান গেয়েছে। কেউ আমার হিম্মতের দিকেও তাকায়নি—যে হিম্মত স্বাধীনতার সড়কে নিজের সব কিছুকে উৎসর্গ করেছে। উৎসর্গ করেছে নিজের যৌবনের সমস্ত বাহার, সমস্ত কামনা, সমস্ত আকাঙ্খাকে। লোকে তোমার গলায় মালা পরালো, কিন্তু কেউ আমার দিকে একটি ফুলও ছুঁড়ে দিল না। বন্ধু, দেশের জন্যে আমি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে ভাষণ দিইনি সত্য, কিন্তু মৃত্যুর দড়ি নিজের গলায় পড়েছি। আমি তোমাকে সম্মান করি, তোমার ঠাঁট বাটকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি এখন খুব ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করতে চাই। তোমারই মতো পাথরের মূর্তি হতে চাই। আমাকে সামান্য একটু জায়গা দাও।

গোখেল মহারাজ বললেন, এখন আমি অপারগ, তোমাকে আমার পাশে জায়গা দিতে পারি না, কেননা আমি অহিংসার পূজারী আর তুমি হিংসার। আমাদের দুজনের পথ ভিন্ন ভিন্ন। তুমি কেন মিউনিসিপ্যালিটির কাছে আরজি পেশ করছ না? ঐখানে যাও, মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। যদি হয়ে যায় তবে আমার আশে পাশে তোমার মূর্তি বানিও না। এই জায়গায় আমার নিজেরই বিরক্ত ধরে গিয়েছে। এই যে পাশে বিরাট গাছ দেখছ, পাখি এখানে বসে আমার মাথার ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আর মানুষও বড় একটা এদিকে আসে না। যখন হকি গ্রাউণ্ডে মেয়েদের ম্যাচ হয় তখন তাদের নগ্ন উরু দেখার জন্যে আমার চারদিকে সবাই উঠে দাঁড়ায়। তখন আমারই এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল হয়ে যায়। রাত্রি বারোটার সময় বেশ্যারা এই চবুতরের বেঞ্চের ওপর মজালুটনেওয়ালাদের সঙ্গে হাসি তামাশা করে আর চুমু খায়।

গোখেল মহারাজ আর বেশী কিছু বলতে পারলেন না, কারণ পুলিস টহল দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। পুলিশ দেখে কর্তার সিং ছুটে পালালো। আমি ওর পেছনে পেছনে খুব ছুটলাম। কিন্তু ও এত জোরে ছুটে পালালো যে আমি ওকে ধরতে পারলাম না। দৌড়তে দৌড়তে আমার দম ফুরিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেখানে আমি দাঁড়ালাম, সেটা একটা সুন্দর বাগান ছিল। বাগানের এখানে ওখানে ছোট ছোট চবুতরের ওপর উড়ন্ত পরিদের মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। আর পরিদের মূর্তিগুলির ঠিক মাঝখানে একটি বড় চবুতরের ওপর দাদাভাই নৌরজীর এক বিরাট মূর্তি কৃপাদৃষ্টি নিয়ে সারা হিন্দুস্থানকে দেখেছিল।

আমি অনেকক্ষণ ধরে হিন্দুস্থানের জাতীয়তাবাদের বৃক্ষরোপণকারীকে দেখতে লাগলাম। ঠিক এই সময় কে যেন বলল, দাদাভাই।

আমি পিছন ফিরে দেখলাম, লম্বা কৃষ্ণবর্ণ একজন মানুষ। তার পরনে সাদা জামা আর খাকি প্যাণ্ট। চোখ এবং ঠোঁট দু'-ই তার বন্ধ ছিল! তার মাথায় ছিল এক গভীর ক্ষত, সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত বইছিল। আবার সেই কণ্ঠ শুনলাম, দাদাভাই।

মনে হল এই লোকটিই কথা বলছে। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না ঠোঁট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ও কেমন ভাবে কথা বলছে?

নৌরজী বললেন, কি খবর বাবা?

লম্বা মানুষটি বলল, দাদাভাই, আমি একজন কারখানার শ্রমিক।

দাদাভাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কোন্ মিলে কাজ করছ?

—দাদাভাই, আমি আমালনেরে ছিলাম, আমার নাম পাটিল। আমার বাচ্চা এবং বুড়ো মা-বাপ আছে। তাদের খরচ-খরচা আমাকেই চালাতে হয়। আমি মজদুরি করে তাদের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি না।

দাদাভাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও? টাকা বাড়াতে চাও?

—হ্যাঁ হুজুর, জিনিস পত্রের দাম বাড়ায়, খরচ-খরচাও বেড়েছে। জীবন ধারণ খুব দুরূহ হয়ে উঠেছে।

—তুমি মিল মালিককে কেন বলছ না?

—মালিক শোনে না।

—তবে সরকারকে—নিজের সরকারকে বল। এখনতো তোমাদের নিজেদের সরকার।

—নিজের সরকারও শোনে না হুজুর। ওরা আমাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই যে আমার মাথায় গুলির চিহ্ন। আমি আমালনের মিল মজদুর। আমার তিনটি বাচ্চা স্ত্রী আর বুড়ো বাপ-মা আছে। ওদের ভরণ-পোষণের ভার আমারই ওপর। আমাকেই ওর হত্যা করেছে। ওরা এখন উপোষ করে দিন কাটাচ্ছে। আমি সব সময় কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়ে এসেছি, আর স্বাধীনতার জন্যে হরতালও করেছি। হুজুর, স্বাধীনতার পর প্রথম গুলিটি আমার মাথায় বিদ্ধ করা হয়েছে।

—তুমি কি চাইছ?

—কিছুই চাই না, শুধু আপনার ছত্রছায়ায় একটু দাঁড়াতে দিন। আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়াকে আমার মাথার এই লাল নিশানা দেখাতে চাই। দাদাভাই, আমার মাথার এই রক্ত কি কোনদিন বন্ধ হবে না? আমার বুড়ো বাপকে কেউ কি রুটি দেবে না? আমার স্ত্রীকে কি

কেউ লজ্জা নিবারনের জন্যে এক টুকরো কাপড় দেবে না? আমর মার মমতা কি পিপাসার্তই থাকবে? দাদাভাই, দাদাভাই বলুন! আপনি তো পার্লামেণ্টে বাঘের মতো গর্জন করতেন। এখন কেন চুপ করে আছেন?

আমার চোখ জলে ভরে উঠল, এরপর আমি আর কিছুই শুনতে পারলাম না। আমি ঐখান থেকে চলে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে এ. আই. সি. সি-র প্যাণ্ডেলের সামনে যেখানে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ছিল সেখানে এসে দাঁড়ালাম। এ. আই. সি. সির অধিবেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দর্শকরাও চলে গিয়েছিল। প্যাণ্ডেল খোলা হচ্ছিল, লম্বা লম্বা বাঁশ লরি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি মূর্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম:

বাপুজী দেখ, তোমার রাম রাজ্যে কী অত্যাচার চলছে। লেংটি-পরা বাপু! আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার পূজারীরা তোমার নামে কি করছে।

কিন্তু মূর্তি আমার কথার কোন জবাব দিল না। কারণ অমাবস্যার রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল,—আর রক্তিম সূর্য উদিত হচ্ছিল। ভোর হয়ে গেলে মূর্তি আর কথা বলে না।

আমার পাশেই একজন শ্রমিক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাকে বলল, চবুতরের কাছ থেকে সরে যাও। এই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? ও বলল, এক মিল মালিক এটা কিনেছে, মূর্তি আজ তার ঘরে উঠে যাবে।

মন্ত্রীর অসুখ

৫ই ফেবুয়াবী, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি. জি. গজানন্দ আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজে সরকারী বাংলোর বারান্দায় বসে তরমুজ খাচ্ছিলেন, এতো বেশী তরমুজ তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন যে হঠাৎই তাঁর পেটে ব্যথা ওঠে—আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'হায়' বলে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কিন্তু অচেতন হওয়ার আগে তিনি অন্তত: এতোটুকু জরুরী কথা বলেন যে, তাঁর পোর্টফোলিও অন্য কাউকে দেবেন না।

৬ই ফেব্রুয়ারী, 'ক্রনিকল'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

ভূষি প্রান্তরের মুখমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাতজন বড় বড় ডাক্তারকে ডাকা হয়। তাঁর পেটের বৃদ্ধি এবং অবস্থা দেখে ডাক্তাররা মত দেন যে, শ্রীযুক্তর চিকিৎসার জন্য কোন ভেটারনারী সার্জনের প্রয়োজন। তাই রাজধানীর সবচেয়ে বড় ভেটানারী সার্জেন ডাঃ এস. কে. পোখর, ডি. ডি. টি. বি. আই. পি-কে স্পেশাল চার্টাড প্লেনে করে ভূষি নগরে পাঠানো হয়েছে। হাই কমাণ্ড এজন্য বিশেষ চিন্তিত যে মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ হওয়া সত্বেও তাঁর পোর্টফোলিও অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে না কেন?

আজ ভূষি প্রান্তরের আর একজন বড় নেতা ভ. ভ. ভুজানন্দ রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়েছেন। শ্রীগজানন্দ অসুস্থ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীভুজানন্দকে শ্রীগজানন্দের দক্ষিণ হস্ত বলে মনে করা হত। শোনা যাচ্ছে তিনি হাই কমাণ্ডারকে এই বলতে গিয়েছেন যে, শ্রীগজানন্দের পরিবর্তে যদি শ্রীভুজানন্দকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্য সাত বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হবে—আর শ্রীগজানন্দ যা দশ বৎসরে সমাপ্ত করার ওয়াদা দিয়েছেন।

৭ ফেব্রুয়ারী, 'স্টাণ্ডার্ড-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

শ্রী জি. জি. গজানন্দ এখনও অচেতন আছেন, কিন্তু তাঁর পোর্টফোলিওর কাজ এ জন্যে আটকে থাকছে না। অচেতন অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যা বের হচ্ছে, তা চিফ সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিচ্ছেন—আর সেই নোট এক জ্যোতিষীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই জ্যোতিষী সাত বৎসর ধরে শ্রী জি. জি. গজানন্দের জ্যোতিষী। তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কাজ চালাচ্ছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী, 'এক্সপ্রেস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

শ্রীগজানন্দ এখন পর্যন্ত অচেতন—পোর্টফোলিওর কাজ নিয়মানুসারে চলছে। চীফ ভেটারনারি সার্জেন শ্রী এস. কে. পোখরকে সহযোগিতা করার জন্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ ওলেনকে আনা হচ্ছে। মিঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার অসুখের একজন বিশেষজ্ঞ। মিঃ ওলেন রোগীকে দেখার পর খুব আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, এঁর এই রোগ কি করে হল—এ রোগ তো অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়াদের হয়। আর এই রোগ সেই সব ভেড়াদেরই হয় যাদের লোম খুব মোটা এবং ত্বকের গভীর পর্যন্ত থাকে। গজানন্দের শরীরে প্রচুর লোম আছে সত্য, কিন্তু এই লোম উল নয়—সে জন্য এ খুবই তাজ্জবের ব্যাপার।

৯ ফেব্রুয়ারী, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী লাগাতার অচেতন অবস্থায় থাকা সত্বেও আঞ্চলিক কেবিনেট যে ঢং-এ পরিচালিত হচ্ছে, তাতে কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন যে, অন্যান্য অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদেরও যদি অচেতন করা যায় তবে কাজ কতো দ্রুত গতিতে এগুবে। 'অচেতন দেশ'-এর প্রস্তাব সম্পর্কে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

১০ ফেব্রুয়ারী, 'টাইমস'-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায়।

ডাঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই রহস্যময় অচেতনতার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই তিনি করতে পারেননি। তাঁর ধারণা রোগীর এই অসুখ ভেড়ার কোন রোগ নয়, সম্বরের যে রোগ হয় এ তাই-ই। ডাঃ ওলেন সম্বরের রোগের বিশেষজ্ঞ নন, তাই তিনি ফিরে গিয়েছেন। এখন ভূষি অঞ্চলের সাতজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা শ্রীগজানন্দের বিষয়ে প্রতিদিন একটি বুলেটিন প্রকাশ করবেন। এই মেডিক্যাল বোর্ডে চিফ ভেটারনারি সার্জেন শ্রীএস. কে. পেখার ছাড়া ডাঃ খারাপানিকর এম. ডি, ডাঃ

সোডাওয়ালা আর. এস. বি. সি, ডাঃ দুবধা রায় কিউ. ইউ. ডি এবং মিস ঘাসলেটম আছেন। মিস ঘাসলেটম মার্গ সঙ্গীত দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন। শোনা যায় তাঁর সঙ্গীতে রোগ পালায়।

১১ ফেব্রুয়ারী, 'অবজারভার'-এর সপ্তম পৃষ্ঠায়।

শ্রীগজানন্দের অবস্থা বড় সঙ্গীন। পোর্টফোলিওর প্রেসার ব্লাড প্রেসারের চেয়ে বেশী। পোর্টফোলিওর জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস কম হচ্ছে কিন্তু নাক বেশী ডাকছে। এমন জোরে নাক ডাকছে যে সারারাত্রি নাকের জেগে থাকার কোন আপত্তি নেই।

গত রাত্রে মিস ঘাসলেটম কর্ণাটক মিউজিক শুনিয়েছেন। কিন্তু মিউজিক রোগীর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উনি তেমনি অচেতন আছেন।

ডাঃ মিস ঘাসলেটম

ডা: সোডাওয়ালা

ডাঃ খারাপানিকর

ডা: দুবধা রায়

ডাঃ কর্ণেল গোমসো বক্স

ডাঃ হয়রানী চক্করথানি

ডা: এস, কে পোথর (ভেটারনারি সার্জেন)

১২ ফেব্রুয়ারী 'এক্সপ্রেস'-এর সপ্তম পৃষ্ঠায়।

যে দিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী অচেতন হয়ে পড়েছেন সেদিন থেকেই তাঁর পেট ক্রমান্বয়ে ফুলে চলেছে। ডাঃ সোডাওয়ালার অভিমত, রোগী 'গর্ভবতী'। কিন্তু রোগী মহিলা নন, পুরুষ। সুতরাং তিনি কি ভাবে 'গর্ভবতী' হবেন! ডা: সোডাওয়ালা ফরাসী মেডিক্যাল জার্নালের উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুরুষও গর্ভবান হয়। তাঁর বক্তব্যে মিস ঘাসলেটম ক্রোধান্বিত হন এবং মেডিক্যাল বুলেটিনে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন, পুরুষেরা এইভাবে জোর পূর্বক মহিলাদের বিভাগে ঢোকার চেষ্টা করছে।

আজ মিস ঘাসলেটম রোগীকে ইমন-কল্যাণ খেয়াল শুনিয়েছেন। শুনতে শুনতে রোগী আরো বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন—অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। লণ্ডন থেকে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ টাইমস বার্থকে আনা হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারী, 'স্টাণ্ডার্ড' এর নবম পৃষ্ঠায়।

ডাঃ দুবধা রায়ের অভিমত রোগী 'গর্ভবান' নন। রোগীর পেটে ভাষণ ফেটে গিয়েছে। অচেতন হওয়ার পূর্বে রোগীর ভাষণ দেওয়ার রোগ ছিল। এখন অচেতন হওয়ার জন্যে ভাষণ কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না। ফলে ভাষণ আবার তাঁর পেটের মধ্যে ফিরে গিয়েছে। পেটের মধ্যে গিয়ে তা জোটবদ্ধ হচ্ছে, সেই জন্যে রোগীর পেট বেলুনের মতো ফুলে যাচ্ছে।

ডা: দুবধা রায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, রোগী যদি এইভাবে অচেতন থাকেন এবং ভাষণ দিতে না পারেন—তবে শীঘ্রই পেট ফেটে তাঁর মৃত্যু হবে।

১৪ ফেব্রুয়ারী, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

মুখ্যমন্ত্রীর পেটের অপারেশন—ভাষণ বেরিয়ে যাবে।

ভূষি অঞ্চলের সেক্রেটারিয়েট এক ঘোষনায় জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রীর পেট অপারেশন হবে। পেটের বাইরে এক মাইক্রোফোন রাখা হবে এবং মাইক্রোফোনের এক টিউব পেটের মধ্যে দেওয়া হবে। এই পদ্ধতিতে পেটের ভেতর থেকে ভাষণ বের করা হবে। হাজার হাজার জনতা সরকারী হাসপাতালের বাইরে জমায়েত হচ্ছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষণ নিজের নিজের হৃদয়ে এমন কি পেটেও স্থান দিতে পারেন—যে পেটের একটি দিক খালি আছে।

১৫ ফেব্রুয়ারী, 'অবজারভার'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

বিশ্বে প্রথম ভাষণযুক্ত পেটের অপারেশন। মুখ্যমন্ত্রীর পেট থেকে তিনশো ভাষণ বের হয়েছে। ডা: টাইমস বার্থ-এর অবিস্মরণীয় অপারেশন।

১৬ ফেব্রুয়ারী, 'এক্সপ্রেস'-এর তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

ডাক্তারের বুলেটিনে ঘোষিত হয়েছে রোগীর অবস্থা ভালো।

১৭ ফেব্রুয়ারী, 'টাইমস'-এর এগারো পৃষ্ঠায়।

অবস্থা ভালো না।

২৫ ফেব্রুয়ারী, 'টাইমস'-এর দশম পৃষ্ঠায়।

আজ ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী দু' আউন্স খিচুড়ি এবং দেড় আউন্স মুসুরডালের জল খেয়েছেন। নিজের বেডে শুয়ে তিনি রেডিও-র জন্যে সতেরো পৃষ্ঠার এক ভাষণ ব্রডকাস্ট করেন। এই ভাষণে তিনি শ্রীভ. ভ. গজানন্দের নাম উল্লেখ না করে বলেন যে, তাঁর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে

উনি তাঁকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস এমন একজন ধোঁকাবাজ থেকে জনসাধারণ দূরে থাকবেন।

২- ফেব্রুয়ারী, 'স্টাণ্ডার্ড'-এর তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

আজ ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাঁর অসুস্থতার আগেই তিনি বহু তরমুজ উগলে বের করেছেন। তিনি বলেন, যখন তরমুজ ফালিফালি করে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে যাচ্ছিলেন তখনই হঠাৎ তাঁর পেটে ব্যথা ওঠে। তাঁর পেটে যে ব্যথা ওঠে, আসলে তা জনসাধারণের জন্যে সমদরদের দরদ। (সমদরদের দরদ দেখুন।)

মুখ্যমন্ত্রী আজ তাঁর রোগশয্যায় পনেরো মিনিটের জন্যে উঠে বসেন। আজকে সকালে নাস্তায় তাঁকে ভেণ্ডিভাজা দেওয়া হয়েছে। দুপুরে তাঁকে দু' আউন্স অরহর ডালের জল খাওয়ানো হয়েছে—এবং রাত্রে আধ আউন্স বোথুয়া শাক দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি অঙ্গীকার করেন, যদি কোনো দেশ তাঁর দেশের ওপর হামলা করে তবে তিনি সেই দেশের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন।

২ মার্চ, 'এক্সপ্রেস'-এর এগারো পৃষ্ঠায়।

ডাক্তারদের বুলেটিনে বলা হয়েছে, আজ ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং হোম থেকে নিজের বাসভবনে ফিরে এসেছেন। নার্সিংহোমের ডাক্তাররা তাঁকে খুব ভালোভাবে মেডিক্যাল চেকআপ করেছেন। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। হৃদয়, মন, পেট, ফুসফুস, যকৃত,—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুস্থ এবং খুব ভালো ভাবে কাজ করছে। ডাক্তাররা শ্রী জি. জি. গজানন্দকে আশ্বাস দেন, তিনি এখন এ্যাসেম্বলির বৈঠকে যোগ দিতে পারেন।

৩ মার্চ, 'স্টাণ্ডার্ড,-এর অষ্টম পৃষ্ঠায়।

আজ মেডিক্যাল বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী ভূষি প্রান্তরের এ্যাসেম্বলিতে যোগ দেবেন এবং সেখানে নিজের পার্টির সদস্যদের কাছে শ্রী ভ. ভ. ভুজানন্দের পার্টি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব আনবেন।

৪ মার্চ, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

আজ এ্যাসেম্বলিতে রওনা হওয়ার সময় শ্রী জি. জি. গজানন্দ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান।

শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে। এবং তরমুজ বিক্রির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

শ্রী ভ ভ. ভুজানন্দ হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

সব চেয়ে বড় পাপ

শঙ্করের যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভোরের আলো ঝুঁকে-পড়া আমের মঞ্জরীর মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে পড়েছিল। দরজা খুলে শঙ্কর প্রায় লাফিয়ে বারান্দায় গেল। হকার বারান্দায় খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে শঙ্কর কাগজটা তুলে নিল। কাগজ খুলতেই মোটা হরফের হেড লাইনের ওপর ওর চোখ পড়ল। চোখ পড়তেই ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। তীরের গতিতে ওর চোখ জলে ভরে গেল। টলমল অশ্রু নিয়েই ও লাইনের ওপর চোখ বুলাতে লাগল এবং তা হৃদয়াঙ্গম করার চেষ্টা করল। কিন্তু ও কিছুই পড়তে পারল না। বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় ওর স্ত্রী বালা চায়ের কাপ নিয়ে এল।

বালা বেশ রুষ্টভাবে ওকে বলল, এত রাত্রি পর্যন্ত লেকচার তৈরী করলে, তবুও তোমার চিন্তা শেষ হল না?

"হুঁ না···কিন্তু···" শঙ্কর অন্যমনস্ক ভাবে বিড়বিড় করে বলল।

বালা শঙ্করের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু' কি? এত দেরীতে তো ঘুম থেকে উঠেছ, এখনও যদি চিন্তাই কর তবে তৈরী হয়ে আমাদের কখন বেড়াতে নিয়ে যাবে? মনে আছে তুমি কি বলেছিলে? আজ তোমার কলেজ বন্ধ।'

'কিন্তু··· ।'

"আমি কোন কিন্তু-টিন্তু শুনব না। তিন মাস হতে চলল তুমি 'আমাকে কোথাও নিয়ে যাওনি। আজ তুমি কথা দিয়েছিলে, তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। বাচ্চারা সকাল থেকে সেজেগুজে বসে আছে। রঞ্জন, দেবী, কান্তা, তিন জনেই তৈরী। তুমিও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। দেখ, আজকের দিনটা কেমন সুন্দর।" বলতে বলতে বালা শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকাল।

আজকের দিনটি অন্য দিনের মতোই নির্মল, স্বচ্ছ; কোমল এবং উত্তপ্ত;

সুন্দর এবং উজ্জ্বল। আকাশে সূর্য ঝলমল করছিল। এখানে ওখানে সাদা-সাদা মেঘের ফালি পাখনা মেলে রাজহাঁসের মতো মন্থর গতিতে সাঁতার কেটে চলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাসে করে চৌপাটির দিকে যাচ্ছিল। ওরা সবাই—শঙ্কর, তার স্ত্রী বালা, ছেলে রঞ্জন, বড় মেয়ে দেবী এবং ছোট মেয়ে কান্তা বাসের দোতালায় বসেছিল।

ছায়াবৃতা রাস্তার ওপর ঝুঁকে-পড়া গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো কখনও কখনও বাসের জানালার পাশ দিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছিল। রঞ্জন হঠাৎ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা গাছ থেকে শুকনো আমের পাতা ছিঁড়ে নিল। আনন্দে চীৎকার করে ও ওর বাবাকে আমের পাতাটা দেখিয়ে বলল, বাবা, দেখ সোনার পাতা।

শঙ্কর বলল, সোনার পাতা নয়, আমের পাতা।

'কিন্তু এর রঙ তো সোনার মতো। দেখ, রোদে কেমন ঝকমক করছে।' বলতে বলতে রঞ্জন দু আঙুল দিয়ে পাতাটাকে ধরে জানালা দিয়ে আসা রোদে রেখে দিল। তারপর হাসতে হাসতে ও পাতাটাকে হাওয়ায় আলতো-ভাবে ছেড়ে দিল। হাওয়া পাতাটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। আর পাতাটা নাচতে নাচতে বহু দূর চলে গেল। বাসও সামনের দিকে ছুটে চলল।

শঙ্কর কি যেন চিন্তা করছিল।

রঞ্জনের সামনের সিটে তার দু' বোন কান্তা আর দেবী বসেছিল। ও তাদের বলল, আমরা প্রথমে রাণীবাগ যাব।

কান্তা তার ছোট ভাই রঞ্জনকে বলল, না, আমরা প্রথমে চৌপাটিতে যাব। বাবা চৌপাটির টিকিট নিয়ে নিয়েছে।

রঞ্জনের কালো আর খাড়া-খাড়া চুল অনেক কষ্টে আঁচড়ানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আলু-থালু হয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কাজল লেপটে গিয়েছিল। ও শঙ্করের হাতের ওপর তার ছোট্ট হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা প্রথমে রাণীবাগ যাব না ?

—'না প্রথমে চৌপাটি।' দেবী বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলল। দেবী একটু কড়া মেজাজের মেয়ে।

রঞ্জন তার বড় বোনকে ধমকে বলল, 'না, প্রথমে রাণীবাগ।' রঞ্জনের মেজাজ দেবীর চেয়েও গরম।

বালা ওদের বলল, 'তোমরা দু' জনে চুপ কর।' বালা শঙ্করের বাচ্চাদের

মা। ওর মেজাজ সব থেকে উগ্র। ও যখন জোরে চেঁচিয়ে উঠল তখন সমস্ত বাসের লোক ওকে দেখতে লাগল। কণ্ডাক্টর মিটমিট করে হাসছিল।

এখন পর্যন্ত কান্তা একটি কথাও বলেনি, এবার ওর বলার পালা। কান্তার সহজে রাগ হয় না। সব সময়েই ওর মুখে এক হাল্কা হাসির রেখা লেগে থাকে। আর অন্যকে রাগায়। ধীরে ধীরে অন্যকে জ্বালাতন করে। হেসে বলল, এ বাস চৌপাটিতে যাচ্ছে, যাচ্ছে। চৌপাটির টিকিট কাটা হয়েছে, হয়েছে। রাণীবাগ যাবে না, যাবে না।

রঞ্জন রাগে ওকে এক ঘুষি মারল। কান্তাও সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের প্রতি-উত্তর দিল। দেবী ওদের দুজনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা দুজনেই দেবীকে মারতে লাগল। বালা তিনজনকেই চড় কষাল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

কণ্ডাক্টর বলল, কি, বাস থামাব?

'না ভাই', শঙ্কর খুব আস্তে বলল, এ তো রোজকার খেলতামাশা। তুমি কতবার বাস থামাবে?

কণ্ডাক্টর বলল, আপনার বাচ্চারা খুব দুষ্টু।

—'হাঁ ভাই, খুব দুষ্টু।'

বালা শঙ্করকে মুখ ঝামটিয়ে বলল, তুমি ওদের কিছু বল না বলে এত বাড় বেড়েছে। সকাল থেকে দেখছি, এদের মাথায় চড়িয়ে রেখেছ —সব আব্দার শুনছ।

রঞ্জন আবার নেকিয়ে নেকিয়ে কাঁদতে লাগল, আমি চৌপাটি যাব না। রাণীবাগ যাব। আমি চৌপাটি যাব না, রাণীবাগ যাব।

শঙ্কর বাস কণ্ডাক্টরকে বলল, বাস একটু থামাও।

রাণীবাগে আফ্রিকার নানারকম গাছ, বাঘ, জিরাফ এবং উটপাখি ছিল। আর ছিল বার্মার সাপ, বাঙলা দেশের চিতা বাঘ, কাশ্মীরের খয়েরি রঙের ভাল্লুক, ঝিল এবং হ্রদের কুমীর, জলে ডুব দিয়ে পয়সা খোঁজে এমন সিল, রঙ বেরঙের পায়রা, ক্লার্কদের মতো শুটকো উট, নেতাদের মতো হরদম কথা-বলা তোতা আর আমীরের মতো চাল-চলন পোষা শুয়োর।

উত্তর প্রদেশের শ্যামবর্ণ হনুমানও এখানে ছিল। হনুমানগুলো লেজ পেঁচিয়ে ঝুলছিল। টাঙ্গানিকার লেজহীন বানরও ছিল। তাদের বক্তব্য বানর আর মানুষের মধ্যে শুধু যদি লেজেরই পার্থক্য হয় তবে আমাদের আবার চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রেখেছে কেন? এক কোণে একটা সাদা রঙের বানর তার সোনালী চুল রোদে শুকোচ্ছিল।

রঞ্জন ওর দিকে বাদাম ছুঁড়ে দিল। ও সেদিকে ফিরেও তাকাল না। বানরটি নীল চোখে মিটমিট করে বেশ গর্ব এবং উদাসীন ভাবে ডাঁট নিয়ে বসে রইল।

বাচ্চারা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল, বানররা তো বাদাম খায়, এ খাচ্ছে না কেন?

শঙ্কর বলল, হয়তো ওর পেটে কোন ব্যথা আছে। কিম্বা ও হয়তো কোন বিশুদ্ধ আর্য-জাতির বংশধর হবে, তাই কালো বাচ্চার হাতে বাদাম খেতে নারাজ।

রঞ্জন ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'হুঁ···হুঁ।' তারপর সে সামনে এগিয়ে গেল।

খোলা-মেলা একটি জায়গায় বাঁশ ঝাড় লাগানো হয়েছিল। আর ছোট্ট একটি বাগানে একটি চিতা বাঘ টানটান হয়ে শুয়েছিল। ওর সামনেই একটি মাদী চিতা তার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছিল। ওর চোখে ঘুমের আমেজ ছিল। কখনও কখনও ও খুব আস্তে আস্তে গর-গর করে ডাকছিল আর হাত দিয়ে আলতো ধাক্কা মেরে বাচ্চাদের নীচে নামিয়ে দিচ্ছিল। আর ওরা খেলতে খেলতে আবার ওর পিঠের ওপর উঠছিল। বাঁশ ঝাড়ের একটা কঞ্চির ওপর বসে একটা তোতা আর তোতি টেঁ টেঁ করে রাণীবাগের দর্শকদের সমানে টিপ্পনী কেটে চলেছিল। আর ছিল খয়েরি রঙের ছোপ ছোপ চকর, সাত রঙের বাহারি ময়ূর, মধুর সঙ্গীতজ্ঞ ময়না, আবাবিল, বুলবুলি, আর আমাদের দেশে যার কোন নাম নেই বোনিওর সেই ঝুটিওয়ালা পাখি। দেবী, কান্তা এবং রঞ্জন রাণীবাগের এ সব কিছুই দেখল। রঞ্জনের চোখের কাজল আরও লেপটে গিয়েছিল। দেবীর দুটো বেনীই খুলে গিয়েছিল। ও ওর গোলাপী ফিতা ওর মার হাতে দিল। শঙ্করের স্ত্রীর হাতে ছিল গোলাপী রেশমী ফিতা আর শঙ্করের হাতে কান্তার সাণ্ডেল। কারণ ঘাসের ওপর কান্তার দৌড়াতে ইচ্ছে করছিল। তিনটি ছেলে-মেয়েই খুব খুশী ছিল। ওদের বাবা-মাকেও তাই খুশী-খুশী দেখাচ্ছিল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে আব্দারের সুরে বলল, বাচ্চাদের সঙ্গে কিন্তু আজকে আমিও হাতির পিঠে চড়ব।

বালা এমন কোমল এবং আগ্রহের সঙ্গে শঙ্করের দিকে তাকাল যেন ছোট্ট একটি মেয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তার বাবাকে দেখছে। শঙ্করেরও তাকে ঠিক

এক ছোট্ট মেয়ের মতোই মনে হল। শংকর হেঁসে বলল, মানুষে কী বলবে! তিন বাচ্চার মা হয়ে···।

উঁহু, লোকে আবার কি বলবে? অন্য মেয়েরাও তো চড়েছে। ঐ যে হাতি যাচ্ছে। দেখ, কতগুলো বাচ্চা নিয়ে ওদের মা বসে আছে। আমিও বসব। আমি কোন দিন হাতির পিঠে চড়িনি।

শঙ্কর প্রসন্নতার সঙ্গে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ওরা হাতিতে ওঠার জন্যে চলে গেল। শঙ্কর পাশেই ঝিলের আসমানী জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখতে লাগল। কাছেই এক ঝোপের পেছনে বারশিঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল। বেহাগ রাগের লয়ের মতো সুন্দর আর নম্র কোকন অঞ্চলের এক মারাঠী মেয়ে তার বেণী চাঁপা ফুলে সাজিয়ে তার ছোট্ট হাতে ছোলা নিয়ে বারশিঙ্গাকে খাওয়াচ্ছিল। এক হাতে সে ছোলা খাওয়াচ্ছিল আর এক হাতে সে আলতো ভাবে তার মাথার ওপর বুলোচ্ছিল। বারশিঙ্গার শিং-এ নরম লোম ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরানো পুকুরের পাথরের ওপর শেওলা পড়েছে। যখন ছোলা শেষ হয়ে গেল তখন বারশিঙ্গা তার লাল জিভ বের করে ওর হাত চাটতে লাগল। শঙ্কর কুমারী মেয়েটির মমতা-ভরা চোখ দুটির দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ এক প্রচণ্ড অট্টহাসি সমস্ত পরিবেশকে অবাবিলের মতো খানখান করে ভেঙ্গে দিল। শঙ্কর ফিরে তাকাল। দেখল, হাতি থেকে নেমে রঞ্জন কান্তার চাকু হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুব জোরে হাসতে হাসতে শংকরের দিকে ছুটে আসছে। কান্তাও ওর পেছনে পেছনে ছুটছে।

—আমার চাকু দিয়ে দে।

—না, দেব না।

—দিয়ে দে বলছি।

—দেব না।

—দিবি না? কান্তা রঞ্জনকে এক চড় মারল।

রঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গে এক চড় মেরে বলল, দেব না।

দু জনে মারামারি করতে লাগল।

কান্তার বেণী খুলে গিয়েছিল। ওর ফ্রকে ময়লা লেগেছিল। রঞ্জনের প্যাণ্ট থেকে কুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবুজে এবং টক কুল দেখে বালার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। বালা রঞ্জনের কান ধরে দুই চড় মারল। রঞ্জন চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। বালা রঞ্জনকে টেনে হিচড়ে কলের কাছে নিয়ে গেল। জল দিয়ে তার চোখে লেপটানো কাজল ধুয়ে

দিয়ে কুলগুলি চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দিল। রঞ্জন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং চৌবাচ্চায় সবুজ হীরার মতো জ্বলজ্বলে গোলগোল কুলগুলির দিকে লোভী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। আর ওর মা যতক্ষণ না ওকে গ্যাস ভর্তি বেলুন কিনে দিল ততক্ষণ ও চৌবাচ্চার কাছ থেকে এক চুলও নড়ল না।

বেলুন নিয়ে ও টক কুলের কথা ভুলে গেল। এদিকে ওদের মা কান্তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাল মাত্র এক দিনের জন্যে ওই চাকু রঞ্জনের কাছে থাকবে। কান্তা রাজী হয়ে গেল।

রঞ্জনের হাতে লম্বা সুতো ছিল। সুতোর মাথায় বেলুন উড়ছিল। বেলুনে গ্যাস ভরা ছিল বলে উড়ছিল। চকে চার-চারটি ফোয়ারা ছিল। তার ওপর দাঁড়িয়ে দেবী, রঞ্জন এবং কান্তা ঘুড়ির মতো বেলুন ওড়াচ্ছিল। ফোয়ারার অনেক উপরে বেলুন হাওয়ায় ভাসছিল। রঞ্জন নিজের বেলুনটাকে ঝটকা টান দিয়ে দিয়ে মাঝের সবচেয়ে উঁচু ফোয়ারার ওপর আনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ফোয়ারার ধারা লেগে বেলুন ফেটে গেল।

রঞ্জন আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

চৌপাটিতে খুব ভীড় ছিল। কান্তা তার মার হাত ধরে ছিল। শঙ্কর দেবী আর রঞ্জনকে সামলাচ্ছিল। চারদিকে অসংখ্য কাচ্চা বাচ্চা মহিলা এবং পুরুষের ভীড়। বালির ওপর ঢাক পলাশ পাতা বিছিয়ে মহিলারা এক হাতে বড়া খাচ্ছিল আর অন্য হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করছিল। এক জায়গায় সাত-আটজন বাচ্চা একসঙ্গে কাগজের বাঁশী বাজাচ্ছিল। কেউ বা সবুজ আর লাল রঙের চশমা কিনছিল, আবার কেউ বা কাগজের কচ্ছপ, ব্যাঙ এবং মাছ সুতোয় বেঁধে সমুদ্রের ধারে দৌড়াচ্ছিল। অমৃতসরের এক নব দম্পতি কুলফির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছিল। তারা তাদের প্লেট থেকে চামচ দিয়ে আইসক্রিম তুলে মুখে দেওয়ার সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রায় ফিসফিস করে বলল, চার মাসের।

শঙ্কর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে ?

'বা., আমি বুঝি মা হইনি ? বালা নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল। তারপর দেবীকে দু হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে বলল, আজ আমি পুরি খাব

—ডাক্তার তো তোমায় নিষেধ করেছেন !

—শুধু আজকেই।

—বেশ।

—চাট···দই-বড়া আর···

—আচ্ছা, আচ্ছা। সিঙ্গাড়া, বারো মশলার চাট, জিরা জলের আর পাপড়াও খেও।

শঙ্করের স্ত্রী অভিভূত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো ? আজ দেখেছি আমার সমস্ত কথা শুনছ। তোমাকে আজ অন্য রকম লাগছে।

শঙ্কর শুধু হাসল। ওর চোখের সামনে সংবাদ পত্রের হেড লাইন আবার ভেসে উঠল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রসন্নতার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, আজকের দিনটি খু-উ-ব সুন্দর।

আজকের দিনটি সত্যিই সুন্দর ছিল—পরিষ্কার, উজ্জ্বল, নীল, ঝকমকে, সোনালী এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গাধা আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। এক চীনা বাজীকর ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার আশ্চর্য খেলা দেখাচ্ছিল। নব বিবাহিতা যুবক-যুবতী কুলফির দোকান থেকে এখন ফলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা কমলা আর ডালিমের রস মিলিয়ে খাচ্ছিল। বাচ্চাদের হৈ-হট্টোগোলের মধ্যেও মাঝে মাঝে মাঝিদের গানের সুর ভেসে আসছিল।

সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে হেলতে লাগল তখন ওরা বাড়িতে পৌছল। শংকরের স্ত্রী টেবিলের ওপর কফি রেখে বারান্দার বড় বড় জানালা দুটি খুলে দিল। নারকেল গাছের ঝিরঝির পাতার ফাঁক দিয়ে আসা পড়ন্ত সূর্যের কিরণে মেঘের দল নারঙ্গী রঙের শিবির গেড়ে বসে ছিল। আর পাথর ভেঙ্গে যে মজদুর মেয়েরা ঘরে ফিরছিল তাদের গান হাওয়া নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে ছুটে চলেছিল। সারা ঘর সুখ আর আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। শংকরের স্ত্রী মধুর আবেশে তার মাথা স্বামীর কোলে রেখে বলল :

আজকের দিনটি সত্যিই খুব সুন্দর। তোমাকে আজ বড় অচেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল প্রেমের অথৈ সাগরের সুন্দরতা, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যদি আজকের দিনের মতো তুমি প্রতিদিন এমনই থাক, তবে তোমার মতো স্বামী আমি সারা দুনিয়ায় খুঁজেও পাব না।

শংকর মৃদু কণ্ঠে বলল হ্যাঁ, আজকে আমার ব্যবহার খুব ভালো ছিল। আজ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিনি, বাচ্চাদের ওপরও রাগ করিনি। আজ সকাল থেকেই আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর কারণ তুমি জানো ?

বালা শঙ্করের কোল থেকে মাথা তুলে খুব আশ্চর্যের সঙ্গে বলল, না তো।

শঙ্কর দুঃখের আবেগে বলল, আজ এথেল রোজেনবার্গ আর তার স্বামীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

'কি ?' বালা নিজেকে কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে উঠে বসল। রঞ্জন রেডিওগ্রামে রেকর্ড বাজাচ্ছিল। রেকর্ড হাতে করে ও শংকরের কাছে এগিয়ে এল। শংকর বলল, আজ দুজন নিরপরাধ নিরীহ মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

কান্তা তার বাবাকে বলল, বাবা, কিন্তু ওদের কি অপরাধ ছিল ?

নিউইয়র্ক শহরে মনরো ষ্ট্রীট নামে যে মহল্লা আছে সেই মহল্লায় রোজেনবার্গ নামে এক মহিলা থাকতেন। তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বৎসর। স্বামীর নাম জুলিয়স রোজেনবার্গ। তাদের দুটি সন্তান ছিল—বড় বড় নীল গভীর চোখ যার তার নাম রোবি, আর সুন্দর রৌদ্রের মতো প্রাণবন্ত হাসি মাইকেল। এই ছোট্ট আমেরিকান পরিবারের মানুষরা নিউইয়র্ক শহরে শান্তি এবং সুখী জীবন অতিবাহিত করছিল।

জুলিয়াস রোজেনবার্গ ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর একটা ছোট কারখানা ছিল। দিনরাত সে এই মেসিন শপে কাজ করে পরিবারের সবার ভরণ-পোষণ করতেন। তাঁর স্ত্রী এথিল নিজের ঘর আর শিশু সন্তানের দেখাশোনা করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁদের বেশ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হত। কিন্তু তা সত্বেও এথেলের মুখে হাসি লেগেই থাকত। কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন পরিশ্রমী এবং তাঁকে ভালোবাসতেন।

এই ছোট্ট সংসারে ডেভিড গ্রীনগ্রাম নামে একজন লোক মাঝে মধ্যেই আসত। ডেভিড ছিল এথেলের ছোট ভাই। এই লোকটি ছিল জাত ভবঘুরে। মহাযুদ্ধের সময় ডেভিড কয়েকবার সেনাবাহিনীর জিনিসপত্র চুরি করে। এই অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মেকানিক লোকটি নিজের বদ অভ্যাসের জন্যে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেঁসে থাকত। ও বহুবার তার বোনাই জুলিয়াসের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। ধার নিয়ে আবার নির্লজ্জের মতো জুলিয়াসের কাছে ধার চাইতে আসত। এই ব্যাপার

নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি হয়। এমন কি ঝগড়া-ঝাটিও হয়। একবার ডেভিড জুলিয়াসের কাছে চার হাজার ডলার ধার চায়। কিন্তু জুলিয়াস তাকে ধার দিতে অস্বীকার করে। তখন বলে, বেশ একদিন টের পাবে।

এ ঘটনা ঘটে উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের জুন ম্যাস। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই জুলিয়াস এবং তাঁর স্ত্রী এথেলকে গ্রেফতার করা হয়। ডেভিড আমেরিকান সরকারের কাছে জবানীতে বলে, ও স্বয়ং একজন গুপ্তচর। নিজের দেশের সেনা-বাহিনীর গুপ্ত দলিল দস্তাবেজ ও বিদেশে পাচার করে। জুলিয়াস রোজেনবর্গ এবং এথেল রোজেনবার্গের পরামর্শ মতো ও তার স্ত্রী রুথের সহযোগিতায় 'লস অলামাস প্রোজেক্ট' থেকে পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত তথ্য চুরি করে এথেল রোজেনবার্গ এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দেয়। আর তাঁরা এই তথ্য সোভিয়েত রাশিয়ায় পাচার করে।

ডেভিড সরকারী সাক্ষী হয়ে যায়। তার স্ত্রী রুথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এথেল রোজেনবার্গ এবং তার স্বামী জুলিয়াস এবং রোজেনবার্গকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। ভাই বোন এবং বোনাই-এর প্রাণ নিয়ে নেয়।

এই খবর প্রাকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত এবং সমঝদার মানুষ ভালো ভাবেই বুঝতে পারল এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এথেল এবং জুলিয়াসকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে।

দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। জজ তাঁর নিজের বিচার বিবেচনায় লেখেন, যদি সরকারী সাক্ষীর ওপর বিশ্বান না করা যায় তবে অপরাধ প্রমাণিত হয় না।

আর সরকারী সাক্ষী ডেভিড গ্রীনগ্রাম তার জবানীতে বলে, আমি উনি শ' পঁয়তাল্লিশ সালে পরমাণু বোমার নকশা এবং টেকনিক্যাল তথ্যের বারো পৃষ্ঠা জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দিয়েছি। এই সমস্ত তথ্য (আমার সাধারণ শিক্ষার সাহায্যে) আমার স্মরণ শক্তির সহায়তায় তৈরী করেছিলাম।

এই বয়ান সম্পর্কে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যঙ্গ করে বলেন, ডেভিডের এই বক্তব্য এত খাঁটি যেন তার কথা শব্দের গতির চেয়েও তীব্র গতিতে দৌড়োতে পারে।

অভিযোগের প্রারম্ভে সরকারী উকিল অপরাধকে প্রমাণিত করার জন্যে একশ তেরোটি সাক্ষীর নাম আদালতে পেশ করেন। সেই সাক্ষীর মধ্যে

ছিল (১) বিশ্ব বিখ্যাত পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের নাম, (২) এফ. ই. বি. (আমেরিকান গুপ্তচর পুলিশ)-এর উচ্চ-পদস্থ কর্তাব্যক্তিরা, (৩) কেস যারা পরিচালনা করছিল পুলিশের সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নাম এবং (৪) রোজেনবার্গের সেইসব বন্ধুদের নাম যারা গুপ্তচর বৃত্তিতে রোজেনবার্গ দম্পতিকে সহযোগিতা করত।

পরে অবশ্য এই সাক্ষীদের কাউকেই আদালতে পেশ করা হয়নি। কেবল সরকারী সাক্ষী এবং তার স্ত্রীর বয়ানকেই যথেষ্ট ধরা হয়।

কিন্তু এই পরমাণু বোমা সম্পর্কিত গুপ্ত রহস্য বাস্তবে কতখানি গুপ্ত ছিল ? এই সম্পর্কে আমেরিকার পরমাণু-শক্তি কমিশনের রিপোর্টে (যে রিপোর্ট ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ—অর্থাৎ অভিযোগ শপর্দের কয়েকমাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল) বলা হয়েছিল ঃ

"পরমাণু-শক্তি কমিশন যে গুপ্ত দলিল সমূহ পেশ করেছে তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪০ সালেই পরমাণু বোমা তৈরীর গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত হয়েছে।"

ঊনিশ শ' চল্লিশ সালেই যে রহস্য আর গুপ্ত ছিল না, সেই রহস্য ঊনিশ শ' পঞ্চাশ সালে প্রকাশ করার অপরাধে দুজন নিরপরাধ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

ফাঁসি কি শুধু অপরাধীদেরই দেওয়া হয় ?

না, কখনও কখনও নিরীহ মানুকেও ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন ?

কখনও বা কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু করে দেয়, আর লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনও বা হিরোশিমার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে, আর সারা দুনিয়ার সামনে গলা ফাটিয়ে নিজের পরমাণু শক্তির এবং বোমার ঠিকেদারীর কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন অত্যাচার প্রতিরোধ করা হয় এবং অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নিজস্ব শক্তি এবং মেধার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উদঘাটিত করেন তখন কারো ওপর ক্রোধ হওয়া তো স্বাভাবিক। তখন কাউকে বলির পাঁঠা বানানো হয় —নিরপরাধ ভালো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। জনসাধারণের মনে বিদেশী গুপ্তচরের ভয় সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই এথেল আর জুলিয়াস রোজেনবার্গের মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ওঁদের মৃত্যুর চেয়ে ওরা যে গুপ্তচর এটা প্রমাণ করাই ছিল ওদের কাছে সবচেয়ে জরুরী।

তাই রোজেনবার্গ দম্পতি নিজেদের নিরপরাধের ওপর যতই জোর দিতে লাগলেন, ততই তাঁদের বিরুদ্ধে আমেরিকান সংবাদপত্রে ঝড় তোলা হল। ফাঁসির কয়েকদিন আগে এমন কি কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁদের বলা হল তাঁরা যদি নিজেদের গুপ্তচর বলে স্বীকার করে নেন তবে মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

এর উত্তর ওঁরা দিয়েছিলেন: "আমরা শহীদ বা হীরো হতে চাই না। আমরা বেঁচে থাকতে চাই—মরতে চাই না। যুবা বয়সে মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। আমরা আমাদের দুই শিশু সন্তান রোবি আর মাইকেলকে মানুষ করতে চাই। আমাদের জীবনের প্রতিটি সত্তা আমাদের কাছে আবেদন করছে আমরা আবার আমাদের সন্তানদের কাছে ফিরে গিয়ে এক সুন্দর, সুখী ছোট্ট পরিবার এবং মধুর জীবন যাপন করি।

"আমরা জানি আমাদের ওপর যে দোষারোপ করা হয়েছে তা যদি আমরা স্বীকার করে নেই তবে আমাদের ওপর থেকে মৃত্যু আজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু এ পথ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ আমরা নিরপরাধ। প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি আমরা নিরপরাধ,—এ কথা এত জ্বলন্ত সত্য যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তা আমরা ছাড়তে রাজী নই। আমাদের জীবনও এর কাছে মূল্যহীন—তুচ্ছ। কারণ আত্মাকে বিক্রি করে যে জীবন কেনা হয় তা কোন জীবনই নয়।

"আমরা নিরপরাধ এ কথা ঘোষণা করে বলছি, আমরা সমাজে সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে ফিরে যাওয়ার অধিকার চাই। আমরা মুক্ত হয়ে এই সমাজে এমন এক দুনিয়া নির্মাণ করতে চাই যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা, রুটি এবং গোলাপ ফুল···।'

এথেল ও জুলিয়াস! তোমাদের এ চিন্তা আপত্তি জনক।

"শান্তি, রুটি আর গোলাপ ফুল!"

গল্প বলতে বলতে শঙ্কর চুপ হয়ে গেল। ওর বাচ্চারা কী বুঝল আর না বুঝল তার কিছুই শঙ্কর জানতে পারল না। ওর স্ত্রী কী বুঝল আর না বুঝল তা ও জানতে পারল না। অশ্রু যদি কারো মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে তবে এই গল্প বহু,—বহু দিন ধরে ইতিহাসের চোখে টলমল অশ্রু হয়ে চকমক করবে।

শঙ্করের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আজকের দিন কী সুন্দরই না ছিল! হয়তো আমেরিকাতেও এমনি সুন্দর দিন হবে—এমনি সুন্দর পৃথিবী, এমনি উন্মুক্ত আকাশ, এমনি এথেলের ঘর, এমনি ওদের সন্তান। আজকের এই দিনটির পর ওরা আর কোন দিন নিজের ঘরে থাকবে না,—কোন দিন আর ওদের সন্তানদের ভালোবাসতে পারবে না। এখন ওরা জেলের মুর্দা-ঘরে পড়ে আছে,—না জানি ওদের সন্তানরা কোথায় —কোন্ রাত্রির অন্ধকারে, কোন্ বিছানার নীচে ওরা চোখের জল লুকিয়ে গুমরিয়ে গুমরিয়ে কাঁদছে। আজ থেকে ওরা আর কোন দিন বাবার ভালোবাসা, মার কোল পাবে না। কেউ আর ওদের আদর করে আইসক্রিম দেবে না—রাণীবাগে বেড়াতে নিয়ে যাবে না, চৌপাটিতে ঘোড়ায় চড়াবে না।

শঙ্করের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে তার তিন ছেলে-মেয়েকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরল।

শঙ্কর নিঃশব্দে উঠে বাইরের বারান্দায় গেল।

পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম বর্ণ ঘোড়া এবং নারঙ্গী শিবির বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আঙ্গুর পাতার মতো হরিৎ সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। মৃদু, নরম ও বিষাদে ভরপুর দমকা হাওয়ায় শঙ্কর এথেল রোজেনবার্গ এবং তার স্বামীর ভালোবাসার মিষ্টি গন্ধ পেল। এই মিষ্টি গন্ধ ছিল—শঙ্কর, তার স্ত্রী এবং তার সন্তাদের জন্যে। আর এই দুনিয়ার যেখানেই মানুষ আছে—যেখানেই শিশুরা খেলা করে, নারী আর পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসে—তাদের সবার জন্যে। দূর বহুদূর থেকে বৈদ্যুতিক ফাঁসির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল।

আজ আবার যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু হল। কিন্তু এ জন্যে শঙ্কর কোন দুঃখ অনুভব করছিল না।

কারণ যীশুখ্রীষ্টের তো বার বার মৃত্যু হচ্ছে। ঊনিশ শ' কুড়ি সালেও তো তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—যখন আমেরিকার পুঁজিপতিরা ইতালিয়ান শ্রমিক সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে ফাঁসি দিয়েছিল। সেই সময়েও সারা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে দুঃখ আর শোকের ঝড় উঠেছিল। যীশুর তো যীশুর আগেও মৃত্যু হয়েছে। এর পরেও এক না এক যীশুর মৃত্যু হতে থাকবে। কিন্তু শঙ্করের দুঃখ অন্য কারণে—রোমানরা যীশুকেই শুধু ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল, আর আমেরিকার পুঁজিপতিরা মরিয়মকেও ফাঁসি দিয়েছিল।

"রোজেনবার্গ দম্পতিকে যখন বৈদ্যুতিক ফাঁসিতে লটকানো হয় ওরা তখন কোন কিছুই দেখছিল না। ওদের দৃষ্টি মাটি বা আকাশে নিবদ্ধ ছিল না। সামনে উপবিষ্ট পাদরি বা অফিসারদের দিকেও ছিল না। ওদের দৃষ্টি যেন দূরে, বহু দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল··· ।

"এথেল কিন্তু বিদ্যুতের প্রথম ঝটকায় মরেনি। একবার—দুবার—তিনবার—পাঁচবার বিদ্যুতের প্রচণ্ড ঝটকায় ওর সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল। প্রতিটি ঝটকায় ওর বুক সামনের দিকে ঠেলে আসছিল, কিন্তু ওর কণ্ঠ দিয়ে কোন চীৎকার বের হয়নি। এই সাংঘাতিক কষ্টেও এথেল মুখ ফুটে বলেনি, 'হে প্রভু, তুমি আমাকে এ কী করলে'—কারণ ও ছিল মরিয়ম—যীশুখ্রীষ্টের মা।'

আঙ্গুরের পাতার মতো গাঢ় সবুজ সন্ধ্যা আরো গাঢ় হয়ে গেল। শঙ্করের স্ত্রী রান্না ঘরে চলে গেল।

রান্না ঘর থেকে এলাচ আর জিরার সুগন্ধ ভেসে আসছিল। কিন্তু শঙ্করের নাকে এই সুগন্ধ অন্য আর এক সুগন্ধের মতো মনে হচ্ছিল। আজ থেকে অনেক—অনেক প্রাচীন এক সুগন্ধ।

পনেরো শ' তেতাল্লিশ সালে বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস পোপের পাদরিদের শিকার হয়ে অপমান এবং দারিদ্রের মধ্যে মারা যান। তিনি তিরিশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রম করে এক গ্রন্থ লেখেন—যাতে কোপার্নিকাসই প্রথম দুনিয়াকে জানালেন, পৃথিবী স্থির নয়,—পৃথিবী ঘুরছে, নিজের কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে। বিশ্বের কেন্দ্র এই পৃথিবী নয় সূর্য। আমাদের সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র—যার চারদিকে অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্র ঘুরছে। আমাদের পৃথিবীও এই নক্ষত্ররাজির মতো সূর্যের চারদিকে এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে।

তাঁর এ বক্তব্য আজ আমাদের কাছে খুব সাধারণ বলে মনে হয়—এ নিয়ে কোন গল্প লেখারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ থেকে চারশ' বৎসর আগে এই সাধারণ কথা সুস্পষ্টভাবে বলার অপরাধে ব্রুনোকে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল।

ব্রোনো নেপলসের এক সাধারণ পাদরি ছিলেন। কোপার্নিকাসের গ্রন্থ পড়ার পর পাদরিদের বিশ্ব তাঁর কাছে ভীষণ সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র মনে হল। পৃথিবী স্থির নয়—ঘুরছে, শুধু এই কথা বলার জন্যে তিনি সারা ইউরোপ ঘুরেছেন। সবখানেই তিনি সংকীর্ণমনা এবং পুরোনো চিন্তাধারার পাদরি এবং মূর্খ ও নিষ্ঠুর শাসকদের অত্যাচারের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন।

নেপলস থেকে পালিয়ে তিনি জেনেভায় আসেন। জেনেভা থেকে প্যারিস। প্যারিসেও তিনি টিকতে পারলেন না। প্যারিস থেকে অক্স-ফোর্ড, লণ্ডন, বিটনবার্গ…।

প্রাগ, হ্যাণ্ডনবার্গ, ফ্রাংকফুট…পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তখন পর্যন্ত স্থির ছিল, তাই পৃথিবী যে স্থির সেই চিন্তাতেই তারা ছিল দৃঢ় চিত্ত।

ভেনিসে তাঁকে গ্রেফতার করা হল। এবং গ্রেফতারের পর রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রোমে তাঁকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেওয়া হয়। তাঁকে বারবার বলা হল, 'পৃথিবী ঘুরছে না,—পৃথিবী স্থির' বললে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ব্রুনো তাদের কথা শুনলেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসে অবিচল রইলেন। ফলে ব্রুনোকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হল।

উনিশ শ' ষোল, সতেরোই ফেব্রুয়ারী নেপলসের নিবাসী গিওরদানো ব্রুনোকে আগুনে জীবন্ত পোড়ানো হল। তাঁর মৃত্যুর আনন্দ উপভোগ করার জন্যে পোপ এবং তার বিশজন প্রতিষ্ঠিত কার্ডিনাল উপস্থিত ছিল।

আজকে এ সব আমাদের কাছে মূর্খামী বলে মনে হয়। কিন্তু একদিন 'পৃথিবী ঘুরছে' এ কথা বলা ছিল মহা অপরাধ। আর সে জন্য এর প্রচারককে আগুনে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল।

আর আজকে আমাদের বিশ্বে এমনই এক ঘটনা ঘটল। আজকে দুজন নিরপরাধ মানুষকে এক মিথ্যা 'অপরাধে গ্রেপ্তার করে বিদ্যুতের শিখায় জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ওদের অপরাধ ওরা বিশ্বে শান্তি চেয়েছিল।

আজ ষোলই জুন, উনিশ শ' তেপান্ন সাল। কারো কারো চোখে 'শান্তি' সব চেয়ে বড় পাপ—যেমন ষোড়শ' শতাব্দীতে 'পৃথিবী ঘুরছে' সব চেয়ে বড় পাপ বলে মনে করা হত।

রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিরাজ করছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। বাতাসেরও নিশ্বাস পড়ছে না।

শঙ্করের স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, আমি ভাবছি রোজেনবার্গের শিশু সন্তানরা এখন কী করছে।

শঙ্কর তার স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিল না। রুমাল দিয়ে সে চশমার ঘোলাটে কাঁচা পরিষ্কার করতে লাগল।

একটি বড় বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের আলোতে তিনটি বাচ্চা পড়াশুনা করছিল। আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। ওরা তিনজন কি এক উদ্দেশ্য নিয়ে উঠে ওদের বাবার কাছে এসে দাঁড়াল।

রঞ্জন এগিয়ে এসে চেয়ারের ওপর হাত রাখল।

শঙ্কর তাকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

রঞ্জন বলল, বাবা রোজেনবার্গের বাচ্চাদের—রোবি আর মাইকেলকে এখানে নিয়ে এস না।

—কেন?

—ওরা আমাদের বাড়িতে থাকবে।

শঙ্কর বলল, তুমি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

রঞ্জন বলল, 'না ঝগড়া করব না।' তারপর সে তার চাকু নিয়ে বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে আরো এগিয়ে এসে বলল, আমি আমার চাকু রোবিকে দিয়ে দেব।

দেবী বলল, আমি পরীদের নতুন গল্পের বই মাইকেলকে দিয়ে দেব।

রঞ্জন বলল, 'বাবা ও আমার ভাই হয়ে এখানে থাকবে। ওকে চিঠি লিখে দাও। ওকে আমার সঙ্গে ইস্কুলে নিয়ে যাব—সেণ্ট হেলেনা হাই ইস্কুলে। আমি ওকে দশ পর্যন্ত গুনতে শিখিয়ে দেব—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট, নাইন, টেন।' রঞ্জন দশ গুনে বলল, বাবা ও দশ পর্যন্ত গুনতে পারে?

রঞ্জনের মা রঞ্জনকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

নিউইয়র্ক, শিকাগো, সান-ফ্রান্সিসকোর মুনাফাবাজরা শোন। আজ শঙ্করের ছেলে রঞ্জন রোজেনবার্গের ছেলের ভাই। আজ সারা দুনিয়ার শিশুরা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। ওয়াল ষ্ট্রীটের ব্রোকার, তোমরা কি দশ পর্যন্ত গুনতে পার! দশ পর্যন্ত, শ' পর্যন্ত লাখ পর্যন্ত? তবে গোন—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শিশু আজকে রাত্রে তোমাদের থেকে নিজেদের পৃথক করে রোজেনবার্গের ছেলেদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। তোমরা কত জায়গায় তোমাদের শূল পুঁতবে? কত মানুষকে তোমরা তোমাদের বৈদ্যুতিক ফাঁসিতে মৃত্যু দেবে? মূর্খ তোমরা। পোপ যদি পৃথিবীর ঘোরাকে বুঝতে না পারে তবে তোমরা কি করে শান্তি আন্দোলনকে বুঝবে? শঙ্কর মনে মনে ভাবছিল।

কোপার্নিকাস এবং ব্রুনো······সাক্কো এবং ভেঞ্জেত্তি······এথেল এবং

রোজেনবার্গ···রোবি এবং রঞ্জন···গুনে যাও। কিন্তু তোমরা কত গুনবে? এ মানব সন্তান—স্পেনের ইকুইজেশান থেকে বৈদ্যুতিক ফাঁসি পর্যন্ত। মানব সন্তানকে আজ পর্যন্ত কে বুঝতে পেরেছে?

মধ্য রাত্রি।

বাচ্চারা শুয়ে পড়ছে, বাচ্চাদের মাও শুয়ে পড়েছে, সারা বাড়ি শুয়ে পড়েছে।

চোখ কোন দিন এমন জ্বালা করেনি, কোন দিন এমন ভাবে শুকিয়ে যায়নি।

শঙ্কর শোয়ার ঘর থেকে বাইরে এল। খুব ধীরে পল রোবসনের রেকর্ড গ্রামোফনে দিতেই বেজে উঠল—'হলি নাইট।'

খুশীর রাত্রি! পবিত্র রাত্রি!

পল রোবসনের উদাত্ত কণ্ঠ সমস্ত পরিবেশকে তন্ময় করে দিল। বাইরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। মাটির সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

খুশীর রাত্রি। পবিত্র রাত্রি। রোজেনবার্গের আত্মোৎসর্গের মতো আনন্দময় এবং পবিত্র।

বাপুজী ফিরে এলেন

তখন সাড়ে পাঁচটার মতো হবে। সবে আমি সান্ধ্য দৈনিক পড়ে উঠেছি, এমন সময় কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা পর্যন্ত উঠে যেতে না যেতেই দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল। তিনি স্বয়ং দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এলেন। ঘরের মধ্যে যিনি এলেন তিনি ছিলেন বেশ ঢেঙা এবং ক্ষীণকায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। বসে আমার দিকে ঝুকে বলতে লাগলেন ঃ

—কি করছ ?

বললাম, হিসেব করছি।

—কিসের হিসেব ?

—এই গত তিন বছরে কত শ্রমিকের বুক তাক করে গুলি চালানো হয়েছে।

উনি হেসে বললেন, আমার তিনটে গুলিও তোমার হিসেবের মধ্যে ধরে নিও।

আমি বললাম, না, আপনার গুলি এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে না, অবশ্য আপনাকে যে গুলি করা হয়েছে তা একই নীতির পরিণাম।

উনি হেসে বললেন, তা আমি জানি। তুমি এখন জলদি জলদি ওঠ। আমি আমার দেশ দেখতে চাই।

আমি বললাম, কিন্তু আপনার তো চিরদিনের জন্যে সমস্ত দুঃখ এবং বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আপনার আর এখন আমাদের দুঃখ এবং বেদনা সম্পর্কে জানার কি প্রয়োজন ?

উনি বললেন, আমি বেশ শান্তিতেই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু নীচে—এই বিশ্বের এত বুক-ফাটা কান্না এবং আর্তনাদ শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, একবার গিয়ে দেখে আসি সেখানে কী হচ্ছে! কেন লোকে আমার কথা এত বলছে।

আমি বললাম, আপনি ঠিক খবর পাননি। মনে হচ্ছে স্বর্গের সংবাদ বিভাগ ঠিক মতো কাজ করছে না। এখানে কেউ-ই আপনার কথা মনে করছে না। আগে লোকে সিনেমায় আপনার ছবি দেখে তালি

বাজাত, এখন রাজ্যের মন্ত্রীদের ছবি দেখে বাজায়। এখন সেই শখও তাদের পূরণ হয়ে গিয়েছে।

উনি বললেন, কিন্তু আমি তো কারখানার বিরাট বিরাট চিমনি দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া দেখেছি···

আমি বললাম, ঐ ধোঁয়া আসলে 'স্মোক স্ক্রীন'—ধোঁয়ার কালো পর্দা—যে পর্দার আড়ালে মিল মালিকরা তাদের ব্যবসাকে সুরক্ষিত করছে। ওরা একদিকে আপনার নাম নেয়—আর অন্যদিকে শ্রমিকদের গলা কাটে। যেমন ঈশ্বরের নামে বকরী জবাই করা হয়।

উনি মুচকি হেসে বললেন, ব্যঙ্গ করা তো তোমার পুরোনো স্বভাব। অনেকদিন আগে আমি ওয়ার্ধায় তোমার 'স্বরাজের পঞ্চাশ বৎসর পরে' লেখাটি পড়েছিলাম। ঐ লেখা পড়ে তোমার ওপর আমার খুব রাগ হয়।

আমি বললাম, হাঁ, ঐ লেখা আমি উনিশ শ' চল্লিশ সালে লিখি। এখন স্বরাজের সামান্যতম ছায়াও আমরা পাইনি। সুতরাং আমার লেখা সম্বন্ধে স্বয়ং আমি আর কী প্রশংসা করব।

আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম। উনি বললেন, যাক, তুমি এখন তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বাইরে চল। আমি একটু আমার দেশ দেখতে চাই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে যাবেন? বাসে গেলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে।

উনি বললেন, আমার জীবদ্দশায় মানুষ তো আমার প্রতীক্ষায় লম্বা লাইন লাগাত। এখন না হয় নিজেই লাইনে দাঁড়ালাম।

বেরিয়ে আমরা রাস্তার মোড়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের সামনে এক সিন্ধী মহিলা দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ছিল একটি কেরোসিন তেলের টিন। সে বেশ রাগের সঙ্গে বলল ঃ

বাসে করে যদি কেরোসিন তেলের টিন নিতে না দেয়, তবে কি করে নিয়ে যাব? এখান থেকে দোকান প্রায় দু মাইল দূর। ক্যাম্পে বিজলী বাতিও নেই। কী রামরাজাই না পেয়েছি। করাচীতে আমরা এমন কী খারাপ ছিলাম? ওখানে ঘর-বাড়ি ছাড়তে হল, দোকানও ছাড়তে হল। বাসে টিন নিতে দিবে না। শুনছি ক্যাম্পে রেশনও বন্ধ করে দিবে। আচ্ছা রামরাজ্য পেয়েছি। এখন আবার গাছ লাগানো হচ্ছে, কী রামরাজ্যই না পেয়েছি।

একজন মারাঠী ক্লার্ক বলল, মাইজী, সারা ভারতবর্ষ যাতে জঙ্গলে

পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেজন্যে গাছ লাগানো হচ্ছে। প্রতিটি গাছে বানর আনন্দে লাফালাফি করবে, আর ভারতবর্ষেও সাচ্চা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

—এই দেখুন, আর একটা বাস বেরিয়ে গেল। পাঁচ পাঁচটা বাস বেরিয়ে গেল—এটাও ভিড়ে ঠাসা। একটা সিটও খালি নেই।

উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত ভীড় কেন?

আমি বললাম, কাছেই শরণার্থীদের ক্যাম্প আছে, সে জন্যে এখানে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাসের সংখ্যা যা ছিল তাই-ই আছে।

উনি বললেন, তবে চল, হেঁটেই যাই। আমি আমার দেশ দেখতে চাই।

মিনিট কুড়ি পরে আমরা স্টেশনে পৌছলাম। ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি স্বর্গ থেকে থার্ড ক্লাশে এসেছেন, না ফার্স্ট ক্লাসে?

উনি বললেন, না, আমি স্টেশন ওয়াগনে করে এসেছি। আর সেটা স্বর্গে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। থার্ড ক্লাশেই চল।

আমি বললাম, আমাদের এখানে এখন এটা পিওর থার্ড ক্লাস। যে থার্ড ক্লাসে আপনি যাতায়াত করতেন সেই থার্ড ক্লাস আর নেই। আপনার সেই থার্ড ক্লাসে বিজলী পাখা ছিল, যাতে আপনার অসুবিধা না হয় সেজন্যে পুরো সিটটাই খালি রাখা হত, আর কাঠের তক্তার ওপর গদি পাতা থাকত। এখন আপনাকে সত্যিসত্যি জনতার থার্ড ক্লাসে যেতে হবে। এ থার্ড ক্লাসে কোন পাখা নেই, কোন গদি নেই। প্রতিটি তক্তার ওপর মানুষ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে ঘামে নেয়ে বসে থাকে।

উনি বললেন, তুমি থার্ড ক্লাসের টিকিটই নিয়ে নাও। আমার দেশের জনতার মধ্যে আমি তোমার চেয়ে বেশী ঘুরেছি।

আমি বললাম, আজকাল কোন কংগ্রেস নেতা বা মিনিস্টার 'জনতার ক্লাসে' যাতায়াত করে না। শুনেছি বিনোবা ভাবেজীও ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করেন—শুধু ফার্স্ট ক্লাসেই নয়, 'এয়ার কণ্ডিশনে'। কখনও কখনও আবার বিশেষ চাটার্ড প্লেনে।

উনি বললেন, তুমি কি শুধু বকবক করেই চলবে, না আমি অন্য কারো সহায়তা নেব।

আমি বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, চলুন কোথাকার টিকিট নেব?

—দিল্লীর।

দিল্লী পৌঁছে যেখানে রাষ্ট্রপতি থাকেন সোজা সেই 'ভাইসরয় ভবনের' দিকে গেলাম।

রাষ্ট্রপতির এ. ডি. সি-কে আমরা বেশ খোস মেজাজেই পেয়ে গেলাম।

আমি তাকে বললাম, ইনি আমার বন্ধু—আমার একজন পুরোনো দয়ালু ভদ্রলোক। ইনি রাস্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চান।

এ. ডি. সি. হিন্দুস্থানী ছিলেন, কথাও হিন্দুস্থানীতে বলছিলেন। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ তিনি ইংরেজী কায়দায় করছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর গলার মধ্যে এমন কোন মেসিন লাগানো আছে যাতে প্রতিটি সুন্দর হিন্দুস্তানী শব্দ তিনি ইংরেজী ধাচে ঢেলে তৈরী করছেন।

—বরা অফশোষ হয়, রাষ্ট্রপতি নই মিল সকতে। দরবার হয়।

আমি আফশোষ করে বললাম, হায় হায়!

—হাঁ, হয় দরবার হয়।

—হায়।

এ. ডি. সি-র কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। উনি বললেন, তো কয়া ম্যয় সাচ নাই বোলতা হউ। হয়, দরবার হয়। রাষ্ট্রপতি বরে মসরুফ হয় দরবার কে অন্দর। নাই মিল সাকতে হায়।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, দরবারে যাওয়ার কোন উপায় আছে?

উনি বললেন, ইয়া তো প্রিন্স হোনা মাংগতা। ইয়া মেম্বর পার্লা-মেণ্ট হোনা মাংগতা, ইয়া কংগ্রেস কা বড় বড় নেতা হোনা মাংগতা।

আমি আমার বন্ধুকে বললাম, শেষের তালিকা অনুযায়ী আপনি যেতে পারেন।

উনি এ. ডি. সি-কে আদেশের সুরে বললেন, তুমি রাষ্ট্রপতিকে আমার এই চিরকুটটা দাও, তিনি আমাকে ভেতরে ডেকে নেবেন।

এ. ডি. সি চিরকুট নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চিরকুট ফিরিয়ে এনে বললেন, রাষ্ট্রপতি বোলতা তুমসে কিসনে মজাক কিয়া? এসে নামকা আদমী অন্দর কেইসে আতা। ও তো রাজঘাট পর হয়।

আমি আমার সাথীকে বললাম, কি রাজঘাট যাবেন, না এখানে সত্যাগ্রহ করবেন?

উনি হেসে এ. ডি. সি-কে বললেন, আমি কি এক মিনিটের জন্যে ভেতরে যেতে পারি ? আমার অনেক স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে।

এ. ডি. সি. বললেন, সোরি আপ কী দাওয়াত নাই। ফির আপ ড্রেস মে নাই।

—কি রকম ড্রেস ?

—অংগ্রেজী ড্রেস চাহিয়ে, আ ফির কালা অচকন হোনা মাংগতা।

আমার বন্ধু আবিষ্ট হয়ে বললেন, আমি বাকিংহাম প্যালেসে এই ড্রেসে ঘুরে এসেছি।

আমি বললাম, সে তো স্বরাজের আগের কথা! এখন আপনি বাকিংহাম প্যালেস কেন, কোন সাধারণ অফিসার বা রাজ্যের কোন মন্ত্রীর কাছেও এই ড্রেস পরে যেতে পারবেন না।

—চলো যাই।

—কোথায় ?

—জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একবার দেখা করব।

নেহরুজীর ওখানে গিয়ে শুনলাম, উনি পাগলা গারদের উদ্বোধন করার জন্যে বোম্বাই গিয়েছেন। নেহরুর ওখান থেকে আমরা সর্দার প্যাটেলের ওখানে গেলাম। গিয়ে শুনলাম উনি অখিল ভারত মাড়ওয়ারি চেম্বার্স অফ্ কমার্সের উদ্বোধন করতে বিকানির গিয়েছেন। ওখান থেকে ফিরে আমরা শ্রী কে. এম. মুন্সীর ওখানে গেলাম। শুনলাম তিনি ভুসাওল এবং মনমাডের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় খেজুর গাছ লাগাতে গিয়েছেন। যোগাযোগ করে জানলাম জগজীবন রামকে ঐ দিন 'কোকাকোলা' কম্পানীর তরফ থেকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হবে। এবং শ্রী কিদওয়াই কোথায় যেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উদ্বোধন করতে গিয়েছেন। শ্রী হরেকৃষ্ণ মহতাব সত্যনারায়ণের নাম কথায় বসে আছেন এবং সরদার বলদেব সিংহ কাশ্মীর গিয়েছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আছেন। শ্রীরাজগোপাল আচারীর আমেরিকার দূতাবাসে নিমন্ত্রণ আছে। এক কথায় বলা যায় পুরো কেবিনটাই ছিল না-পাত্তা।

আমি বললাম, বলুন এখন কি করা যায় ? কোন ডেপুটি মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবেন ?

উনি জিজ্ঞেস করলেন, ডেপুটি মিনিস্টার আবার কি ?

বললাম, এ বড় মজার চিজ—মিনিস্টারের নীচে, ডেপুটি সেক্রেটারীর ওপরে। অনেকটা দুটো জমির মাঝখানের সীমারেখা বা আলের মতো।

উনি নাকের ওপর চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, আমি এই মাঝখানের সীমারেখা কোনদিনই পছন্দ করিনি।

আমি বললাম, আপনি কিন্তু এ কথা বলতে পারেন না। আপনার অহিংসা তো দু টুকরো জমিনের মাঝখানের সীমারেখাই। অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংসা সংগ্রাম আর বোম্বাই-এর শ্রমিকদের ওপর গুলি। হিন্দী বা হিন্দুস্তানী মাঝখানের আল ছিল না তো কি ছিল? খিলাফত আর গো-সেবা, মসজিদ-মন্দির-ঐক্য, পুনা এওয়ার্ড, এরউইন প্যাক্ট, মাউন্টবেটন ঘোষণা।—যেন নয়া স্বাধীনতার সমস্ত কাঠামোর ভিত্তিই এই মাঝের আলের ওপর তৈরী করা হয়েছে। মাঝের এই আলের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘর-বাড়ি লুট হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হয়েছে, গুলি চলেছে, এক দুই তিন, আপনার বুক লক্ষ করে···ক্ষমা করবেন···।

উনি বললেন, তোমার মাথা দেখছি আগের চেয়ে আরো বিগড়ে গিয়েছে। আচ্ছা, এখন এখান থেকে চলো।

আমি তাঁকে বললাম, শরনার্থীদের ক্যাম্প দেখেছেন? চলুন আপনাকে বোম্বাই-এর কোলিবাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাই—সেখানে পাঁচশ' মানুষের জন্যে মাত্র একটি শৌচাগার আছে। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পও এর চেয়ে বেশী পরিচ্ছন্ন ছিল। বোম্বাই-এর ক্যাম্পের শরণার্থীরা তাদের দুঃখ-কষ্ট সরকারকে জানানোর জন্য যখন মিছিল বের করে তখন তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। আজকাল গুলি এমন বর্ষণ হয় যেন ভাদ্রের বর্ষা।

উনি কিছু চিন্তা করে বললেন, চলো, যেখানে আমি প্রথম কৃষক আন্দোলন শুরু করেছিলাম সেই চম্পারন চলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এবারও কি থার্ড ক্লাশের টিকিট কাটব? থার্ড ক্লাশে এসে আমার হাড়-মাংস এক হয়ে গিয়েছে। কাঠের তক্তার ওপর বসে বসে আমার সারা শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে।

উনি বললেন, দাঁড়াও, আমি স্বর্গ থেকে স্টেশন ওয়াগন আনাচ্ছি। আমার আবার এখন খিদেও পেয়েছে।

আমি বললাম, তবে আপনার বকরী চেয়ে পাঠান। দিল্লীতে বকরীর দুধ কোথাও পাবেন না। আপনার ভক্ত অনেক পাবেন, কিন্তু তারা কেউ বকরী পোষে না।

—লোকে আজকাল তবে কি পোষে ?

—যারা বড়লোক তারা ‘পারমিট’ এবং ‘এ্যালোটমেণ্ট’ পোষে, যারা জুয়াড়ু সেঠ তারা আমেরিকার ‘বন্ধুত্ব’ পোষে এবং ডলারের জুতো চাটে। যারা ঘুষখোর অফিসার তারা কালো রঙের ‘পোকার্ড’’ গাড়ি পোষে। আর যারা আমার মতো মূর্খ তারা নিজের ‘বুদ্ধি’ চাটে এবং কষ্ট ও দারিদ্রতাকে পোষে।

—এ সব কথা বাদ দাও। আজকে আমি তোমাকে এমন সুন্দর বকরীর দুধ খাওয়াব যে তুমি সারাজীবন মনে রাখবে।

—শুনেছি আপনি বকরীকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ান আর ভিটামিন ইনজেকশন দেন। ভাল কথা আপনার বকরী স্বর্গে কি খায় ?

—অন্য কিছুই খায় না, শুধু অমৃত খায়।

আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম। এমন সময় স্বর্গ থেকে স্টেশন ওয়াগন এসে গেল। আমরা স্টেশন ওয়াগন করে চম্পারনে এসে পৌঁছলাম।

ঝব্বু আমাকে বলল, তোমার এই বন্ধুর মতো একজন লোক আমাদের জেলায় একবার এসেছিল। ঠিক এই রকমই হাসত। তখন আমার দু বৎসর জেল হয়েছিল। ঐ সময় আমি যুবক ছিলাম। জেলে যেতে তখন আমার ভালোই লেগেছিল।

আমি ঝব্বুকে জিজ্ঞস করলাম, কেন ?

ও বলল, খাজনা খুব বেশী ছিল, জমিদার বেগার খাটাত, ইংরেজ সরকারের আমলারা খুব অত্যাচার করত। ঠিক তোমার এই বন্ধুর মতোই দেখতে মানুষটির ওপর আমরা—আমি এবং আমার গ্রামের সমস্ত লোক ভরসা করেছিলাম। তার কথামতো জেলে গিয়েছিলাম, চাকি ঘুরিয়েছিলাম, বাড়ি-ঘর ছেড়েছিলাম, জমি চাষ করা বন্ধ করেছিলাম···।

আমার বন্ধু ঝব্বুকে জিজ্ঞেক করল, এখন কেমন আছ ? এখন নিজেদের দেশে নিশ্চয়ই খুব আনন্দে আছ।

ঝব্বু বুক-ভরা শীতল দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, হাঁ, তা ঠিক। নিজের রাজ তো নিশ্চয়ই, কিন্তু জমি নিজের নয়। জমি তো ঐ জমিদারের, আর তার অত্যাচার একইভাবে চলেছে। তার ওপর সরকার আছে, সরকারও ঠিক তেমনি, যেমন স্বাধীনতার আগে ছিল। কেবল টুপি বদলেছে, আর কিছুই বদলায়নি। আগে ইংরেজী টুপি ছিল, এখন গান্ধী টুপি। গত মাস থেকে আবার আঁকাল লেগেছে। শুনছি দিল্লীর

উজিররা তা মানতে রাজী নন। তাঁরা বলছেন—বিহারে আকাল কেমন করে হবে? কালকেই আমাদের গ্রামের কুমার না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে। আমাদের উজীররা তা মানবেন কেন? সবাই মরে গেলেও আকাল হবে না। এর উপর তহশীলদার বলছে, গাছ বাড়াও। এই জমিতে এক ছটাকও চাল হবে না, গাছ কেমন করে বাড়ানো হবে।

উনি ঝব্বুকে বললেন, তোমরা সত্যগ্রহ করছ না কেন?

ঝব্বু চারদিক নিমেষে তাকিয়ে নিয়ে বেশ রহস্যময় ঢং-এ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'খুব আস্তে এ সব কথা বল ভাই। কেউ কিছু শুনে ফেললে গুলি চালাবে। চার দিনের তো জীবন, কোন মতে কেটে যাবে। ঐ ল্যাংগুটিওয়ালাকে যেন ভগবান ভালো করে। দোস্ত কেমন ধোঁকা দিয়েছে। ওনার চেলা-চামুণ্ডারা তো বেশ মজায় দিন কাটাচ্ছে। আর এদিকে ঝব্বু যেমন আগে যাতায় পিসে মরছিল, তেমনি পিসে মরছে। কী রামরাজ্য না এসেছে, এর থেকে রাবণ রাজ্য ঢের ভালো ছিল···। ওর দু চোখ ছলছল করে উঠল।

আমি বন্ধুকে বললাম, ঝব্বুর কাছ থেকে যদি আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তবে দেরী করি, তা না হলে চলুন অন্য কোথাও যাই।

ওনার গলা ভারী হয়ে গিয়েছিল। বললেন, না আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। এখান থেকে চল।

আমি বললাম, তবে এখন কোথায় যাব? সালেন জেলে—যেখানে একুশজন কমিউনিস্ট বন্দীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে?

—না।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, বেশ তবে কি আপনি ত্রিবান্দ্রমে যেখানে বকরী কাটা হয় সেই স্লটার হাউস দেখতে যাবেন—যে স্লটার হাউস একজন কংগ্রেসী ঠিকেদারী নিয়েছে।

—না, না।

—তবে আচার্য কৃপালনীর সঙ্গেই দেখা করুন। তিনি আপনাকে বলতে পারবেন কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডলী কি ভাবে গঠন হয়, আর কি ভাবে বদল হয়। কি করে এবং কেন মন্ত্রী বানানো হয় আর হটানো হয়।

—না, না।

—বেশ, তবে কাশ্মীরে চলুন—ঐখানে ভারত আর পাকিস্তানের সৈন্যরা পরস্পরের মুখোমুখি কেমন সত্যাগ্রহ করছে দেখতে পাবেন।

—না ভাই, আমি আমার দেশের সত্যিকারের অবস্থা দেখতে চাই।

—আপনি আপনার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কণ্ট্রোলের মূল্যতালিকা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনি যখন মারা যান তখন থেকে এখন জিনিস পত্রের দাম কম করে হলেও তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। আগে চিনি পাওয়া যেত না, এখন গুড়ও কালোবাজারী হচ্ছে। খদ্দরও। পার্থক্য শুধু এই যে, গুড় যদি কালোবাজারীতে লুকিয়ে থাকে তবে খদ্দর কালোবাজারীকে ঢেকে রাখে। জনসাধারণের হাতে কেবল চড়কাই আছে।

উনি হেসে বললেন, আগেও আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতাম না, এখনও করি না। আমি নিজেই জিজ্ঞেসবাদ করব। চলো বোম্বাই যাই। বোম্বাই-এ অনেক কিছু জানা যাবে। ঐখানে পৌঁছে আগে কাপড়ের দাম জানতে হবে।

—কাপড়ও দুরকমের আছে, এক হচ্ছে বড়লোকদের কাপড়, যার দর সরকার পৃথকভাবে বেঁধে দিয়েছেন। আর এক গরীবদের কাপড় আছে যার দর গত দু বছর ধরে একই ভাবে চলে আসছে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ ঐ ল্যাংগুটি। দর যাই হোক না কেন—রাম রাজ্যই হোক আর রাবণ রাজ্যই হোক—গরীবদের জন্যে শুধু ঐ এক ল্যাংগুটি।

উনি আমাকে বললেন, আগে তুমি এমন ছিলে না, এখন এ রকম কথা বলছ কেন?

—হাঁ, আগে আমার চিন্তা-ভাবনা এমন ছিল না। আমি তখন নরম নরম সবু আঙ্গুল আর গোলাপ পাপড়ির স্বপ্ন-জগতে বিচরণ করতাম। এখন আমার চিন্তা দ্বিগুণ তিনগুণ চারগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। হঠাৎই আমার মেহেদি রঙে রাঙানো আঙ্গুলগুলি মাটিতে স্পর্শ করল—গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল—যাকে আমি ভালোবাসতাম সে আমার বেকার জীবনের ওপর রাগ করে এক সাট্টাবাজের সঙ্গে চলে গেল।

উনি আমাকে বললেন, বকরীর দুধ খাবে?

—আপনার স্বর্গের বকরীর দুধ আমি খাব না। কারণ অমৃতপান-করা বকরীর দুধ খেয়ে আমি চিরজীবী হতে চাই না।

—কেন?

—চিরজীবী হওয়া অনাগত শিশুদের পক্ষে অমঙ্গলকর। অল্পদিন বেঁচে থাকাই ভালো এবং উচিতও বটে। মৃত্যুর পর দুনিয়া চিরদিনের জন্যে ভুলে যাবে।

—তার মানে ?

—মানে, পুরোনো ফুল যেমন অল্প কয়েকদিনের জন্যে প্রস্ফুটিত হয় এবং সৌরভ ছড়িয়ে শুকিয়ে যায়, তার জায়গায় প্রস্ফুটিত হয় আবার নতুন ফুল, ঠিক তেমনি।

কথা বলতে বলতে স্টেশন ওয়াগন এসে গেল। আমরা দুজন ভিণ্ডি বাজারে পৌঁছলাম।

কামাল বলল, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে ?

কামাল বলল, আপনি আমেদাবাদে এলে সারাভাই-এর ওখানে থাকতেন, আর আমি তার মিলে কাজ করতাম।

—এখন কোথায় কাজ কর ?

—এখানে, সায়সুন মিলে কাজ করি।

—ইংরেজদের মিল কি এখনও এখানে আছে ?

ইংরেজদের কোন্ জিনিস এখান থেকে গিয়েছে ? ইংরেজী তো এখানে বহাল তবিয়তে আছে।

—কাপড়ের কি দর ?

—জানি না। দু বৎসর হল আমি কোন কাপড়-টাপড় কিনিনি।

—কেন ?

—রুটি, ঘরভাড়া, অসুখ-বিসুখ, বিজলী, জল আর বিড়ির জন্যে খরচ করে আমার হাতে আর একটি পয়সাও থাকে না।

—তোমার স্ত্রী কোথায় ?

—পাকিস্তানে।

—কেন ?

—যখন দাঙ্গা হয়েছিল তখন ও আম্মার সঙ্গে চলে গিয়েছে। আমিও চলে যেতাম কিন্তু আপনি আমার জান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার স্ত্রীকে আবার নিয়ে আসছ না কেন ?

—কেমন করে নিয়ে আসব ? খরচে কুলোবে না। শ্রমিকরা হরতাল করছে।

—হরতাল কেন করছে ?

—বোনাস পাইনি বলে।

—বোনাস ? কিসের জন্যে ?

—মিল মালিকরা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে একবার আপনি কণ্ট্রোল তুলে দিয়েদিলেন, আর তখন মালিকরা কোটি কোটি টাকা এহাত-ওহাত করেছে।

—হাঁ, ওটা আমার ভুল ছিল।

—ভুল আপনার ছিল, আর আমরা তার জের এখনও টেনে চলেছি। স্বাধীনতার বয়স যত বাড়ছে জিনিসের দাম ততই বেড়ে চলেছে।

—তুমি কি চাও ?—বোনাস ?

কামাল বলল, না, বোনাস চাই না। চাই নিজেদের রাষ্ট্র। সমস্ত কল-কারখানা আমরা চালাব, সমস্ত ক্ষেত-খামার আমরা নিজেরাই চাষ করব, সমস্ত মেহনত আমরা নিজেরাই করব, আর সমস্ত ফল আমরাই ভোগ করব।

উনি হেসে বললেন, তবে গুলি চলবে।

কামাল বলল, তা জানি। কিন্তু আপনি কি আমাকে এক ল্যাংগুটিতে দেখে খুশী হয়েছেন ? তাই যদি আপনি চেয়েছিলেন তবে আমার জান বাঁচিয়েছিলেন কেন ?—কুড়ে কুড়ে মরার জন্যে ?

উনি বললেন, আমি নিজেই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ল্যাংগুটি পড়েছি।

কামাল বলল, সেতো দেবতা হওয়ার জন্যে—মহাপুরুষ হওয়ার জন্যে। দেশ একবারই মহাপুরুষ পায়—তাতে সমস্ত দেশ জেগে ওঠে। কিন্তু আমার আফশোস, আমাদের দেশের জীবন মহাপুরুষ পাওয়া সত্ত্বেও যেমন কে তেমন আছে। যেমন ল্যাংগুটি ছিল তেমন ল্যাংগুটিই থেকে গেল···।

—কামাল, সন্তুষ্ট হতে শেখ।

কামাল হেসে বলল, বেশ চলুন, বোনাসই শুধু দিয়ে দিন। আসুন হাত মেলাই।

উনি হাসতে হাসতে কামালকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যে হরতাল করছ তার কোন প্রভাব মিল মালিকের ওপর পড়েনি ?

দুবার গুলি চালিয়েছে। আরো চালাবে। ঘরের ঘটি-বাটিও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আহমেদাবাদের মিল মালিকরা খুব খুশী, কারণ বোম্বাই-এর মিল বন্ধ আর তাদেরটা চালু আছে। অর্থাৎ আমাদের কাছে যা মৃত্যুর সামিল, তা ধনিকগোষ্ঠীর কাছে জীবন।

—আমার স্বরাজে বাঘ আর বকরী এক ঘাটে জল খায়।

—তা বোধ হয়, চিড়িয়াখানায় কিম্বা সার্কাসের ঘাট হবে, জঙ্গলের ঘাট নিশ্চয়ই নয়।

—আমার স্বরাজে ধনী আর গরীব দুই সমান।

—আপনার এ স্বরাজ পুঁজিপতিদের স্বরাজ। এ গরীবদের স্বরাজ হতেই পারে না।

—তুমি অন্যের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছ।

যদি কারো অধিকারে একটা গোটা কারখানা থাকে, আর আমার অধিকারে শুধু একটি ঝুপড়ি, যদি কারো অধিকারে ইউরোপের ঐশ্বর্য থাকে, আর আমার অধিকারে চা খাওয়ারও পয়সা না থাকে, যদি কারো সন্তানের বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার থাকে, আর আমার সন্তানের চার অক্ষর পড়ারও অধিকার না থাকে, তবে অন্যের অধিকার আমি অবশ্যই ছিনিয়ে নেব।

—কামাল, মনে হচ্ছে তুমি খুব ক্ষুধার্ত।

—'হাঁ, আমি দু'দিন থেকে কিছুই খাইনি। দেড় মাস ধরে আমি হরতাল করছি।' কামাল বেশ রুক্ষতার সঙ্গে বিদ্রুপের হাসি হেসে চলল।

—এসো, তোমাকে বকরীর দুধ খাওয়াচ্ছি।

কামাল হেসে বলল, ভীষণ খিদে লেগেছে। বকরীর দুধে সে খিদে কি ভাবে মিটবে? সামনে নুরের কাবাবের দোকান আছে, ওখান থেকে কিছু আনিয়ে দিন।

এর মধ্যে স্টেশন ওয়াগান এসে গেল। আমরা কুড়প্পাতে চলে গেলাম।

কুড়প্পাতে 'শান্তি মিছিল' বের হয়েছিল। শান্তির মিছিলে গ্রামের মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, গরীব ক্লার্ক, ছোট ছোট গরীব দোকানদার, বেকার যুবক আর গরীব সাংবাদিকরা যোগ দিয়েছিল। তাদের হাতে ঝাণ্ডা ছিল। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল:

আমরা শান্তি চাই।

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক!

তৃতীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ হোক!

যারা প্রথম পরমাণু বোমা ফেলেছে, তারা জনতার শত্রু।

আমিও সেই মিছিলের সামিল হয়ে গেলাম। উনি হেসে পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন:

—তোমরা শান্তি কেন চাও?

—বাচ্চাদের পড়াচ্ছি এই জন্যে চাই।

—তোমার নাম কি?

—সুব্বারাও।

—কত টাকা মাইনে পাও?

—বাইশ টাকা।

—বাইশ টাকাতে কি ভাবে চালাও?

—না খেয়ে থাকতে হয়।

—তাও শান্তি চাচ্ছ?

সুব্বারাও একটু থেমে বলল, শান্তি!···আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। হাঁ, আমি তবুও শান্তি চাই। শান্তি এই জন্যে চাই যে আমি ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পড়াই। তাদের পড়িয়ে আমি আনন্দ পাই। শান্তি আমি এই জন্যে চাই যে আমার বৃদ্ধা মা আছেন। খুব বেশী হলে আমার মা আর আট-দশ বছর বাঁচবেন। মা আমাকে কত পরিশ্রম করে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন। যত কঠোর পরিশ্রম করেই হোক তাঁকে যদি একটু আরামে রাখতে না পারি তবে আমার এ জীবন ধিক। এই জন্যেই আমি শান্তি চাই—মা কার না আদরের হয়। আর কোন না কোন একদিন কোন মেয়েকে ভালোবাসব—তুমি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছ কেন আমি শান্তি চাই।

আমার বন্ধু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একজন কৃষককে—যে শ্লোগান দিচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খাজনা, জমিদারের হিস্যা আর সুদ দিয়ে তোমার কি থাকে?

—একবেলা খাবার। আর যদি ফসল ভালো না হয়, তবে তাও জোটে না।

—তবু তুমি শান্তি চাও।

'হাঁ', কৃষকটি থেমে থেমে বলল, একদিন পৃথিবীতে বসন্তের সমাগম হবে। ঐ দিনের জন্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই।

আমি বললাম, এরা কত সুন্দর।

আমার বন্ধুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমি শেষ পর্যন্ত এদের মিছিলে থাকব। মানুষ যদি আমার কথার ওপর গুরুত্ব দেয় তবে এদের সভায় আমি ভাষণ দেব।

আমি বিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এরা ভারতবর্ষের নতুন মানুষ।

এই আত্মবিশ্বাসে জনসভায় আমি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বললাম, ইনি একজন পুরোনো কংগ্রেসী। হাঁ, আমি তাঁর নাম বলিনি—কারণ নাম বলা আমি ঠিক মনে করিনি।

উনি তাঁর ভাষণে বললেন, ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলন আজকের নয়—বহুদিনের। এখানে যুদ্ধপ্রিয় এবং রক্তপিপাসুরা বারবার এসেছে কিন্তু শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তিপ্রিয় জনতার সহযোগিতায় তাদের মোকাবিলা করেছে। শান্তির শক্তি এবং তার বিজয় আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় দেখা যাবে। গৌতম বুদ্ধ, অশোক, আকবর, নানক, কবির, চিস্তি···শান্তি তো ভারতবর্ষের আত্মা, ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম—তার সত্যিকারের সভ্যতা এরই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যে ভালো ভালো মানুষরা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। আজকে যখন দুনিয়াতে শান্তির প্রয়োজন তখন ভারতবর্ষের মানুষ একমত হয়ে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে শান্তিপ্রিয় মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আর এর জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, কেননা আমার বিশ্বাস···

এর পরে উনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কারণ পুলিশ মিছিলকে বেআইনী বলে ঘোষনা করে দিল এবং লাঠি চালাল। লাঠি চালানো সত্ত্বেও যখন মানুষ হটল না তখন গুলি চালাল। ওনার আবার গুলি লাগল—একটি নয়, দুটি নয়, তিন তিনটি গুলি ওনার বুকে এসে লাগল। 'হায় রাম' বলে উনি প্লাটফর্ম থেকে নীচে গড়িয়ে পড়লেন। নীচে পড়তে না পড়তেই তাঁর দেহ শীতল হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আমাকে থানায় নিয়ে গেল। পুলিস ইনসপেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটাকে চেন?

আমি বললাম, হঁ, ভালোভাবেই চিনি। এনার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনি আমাদের দেশের নেতা। আজকে দ্বিতীয়বার আবার তাঁকে হত্যা করা হল।

কুত্তা-প্লানিং

প্রথমে ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টারকে বললেন, আপনি আজকের সংবাদপত্র দেখেছেন ?

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টার এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, আজ কত তারিখ ?

—চব্বিশে জানুয়ারী।

—'গুড গড ! দিন কেমন করে চলে যাচ্ছে, কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।' ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মুখে ধোঁয়া নিয়ে বললেন, কাল থেকেই তো নতুন বর্ষ আরম্ভ হয়েছে। উঃ কী বিরাট পার্টিই না হয়েছিল। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন মিস মনচন্দা কী সুন্দর শাড়ি পড়ে এসেছিলেন।

ডেপুটি মিনিস্টার তাঁকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, আজকে 'টাইমস'-এর সাত পৃষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

'আমি শুধু ঐ সংবাদ পত্রই পড়ি, যাতে আমার ভাষণ ছাপা হয়। আজ দু দিন থেকে আমি কোন ভাষণ দিইনি। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ খবর আর কী হতে পারে।' মিনিস্টার সিগারেটে এক লম্বা টান দিয়ে বললেন।

ডেপুটি মিনিস্টার খবর পড়িয়ে শোনালেন, জামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্তী অনিয়াবাদে এমন এক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে যা দিয়ে কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করা যেতে পারে। এই প্রোজেক্ট যাঁরা আরম্ভ করেছেন তাঁরা কুত্তাদের বর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে রুখতে চান। কারণ এই প্রদেশের মানুষরা কুকুরদের জানে মারতে রাজী নয়। স্বাস্থ্য রক্ষা বিভাগ ভেটারনারি ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় এই প্রোজেক্ট আরম্ভ করবে।—এই প্রোজেক্ট মারফত সীমিত ক্ষেত্রে কুত্তাদের অপারেশন করে নপুংসক করা সম্ভব হবে।

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টার খবর শুনে বললেন, মূর্খ কোথাকার।

মানুষেরই ফ্যামিলি প্লানিং ঠিকমতো হচ্ছে না, কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করে কি হবে? অযথা পাবলিকের টাকা নষ্ট হবে।

ডেপুটি মিনিস্টার তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, বিলকুল ঠিক। আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার মাথায় এই চিন্তা এ জন্যে এসেছিল যে আমাদের এখানেও তো ফ্যামিলি প্লানিং সফল হয়নি, কিন্তু নতুন বাজেট পাশ হওয়ার পর আমাদেরও নতুন ভাবে কাজকর্ম দেখানোর প্রয়োজন আছে। সে জন্যেই এই খবরকে আমি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ছিলাম।...' ডেপুটি মিনিস্টার আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন।

'হুঁ...।' ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টার এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ কিছু চিন্তা করে উনি বললেন, পরিকল্পনাটা নেহাত খারাপ নয়। আমাদের এই প্রদেশেও তো কুত্তা আছে।

'অবশ্যই আছে'। ডেপুটি মিনিস্টার বললেন, আমি কোন কুত্তার ইন্টারভিউ নিইনি।...মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েই ফুরসুৎ পাই না...হবে অবশ্যই...কি পরিকল্পনা, চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করব?

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিস্টার চীফ সেক্রেটারীকে ফোন করে তাঁর ঘরে ডেকে আনলেন। চীফ সেক্রেটারী খবর পড়ে এবং পরিকল্পনা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন সমস্যার ওপর রায় দেওয়ার আগে উনি চুপ করে থাকা পছন্দ করেন। তা মন্ত্রীদের বুদ্ধিই হোক আর কুত্তাদের উদ্ধারই হোক।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, কুত্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশী নেই, কারণ ছোট বেলা থেকে টিয়া পোষার আমার সখ ছিল। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে জয়েণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে ভালো হয়। ওনার বাড়িতে পাঁচ-পাঁচটা কুত্তা আছে।

জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কাছে যখন এই প্রস্তাব রাখা হল, তখন তিনি সচকিত হয়ে বললেন, স্যার, যে কুত্তাদের সম্পর্কে আমি জানি সে-গুলো খুব সংযমী এবং উচ্চ খানদানের। ওদের দেখাশোনার জন্যে আমি একজন কর্মচারী রেখেছি। আমার কুত্তা সময় মতো খায়, সময় মতো ঘুমোয়, সময় মতো জাগে, সময় মতো স্নান করে, সময় মতো বেড়াতে যায়। ওদের হাব-ভাব একেবারে মানুষের মতো। এ রকম উচ্চ খানদানী কুত্তাদের জন্যে ফ্যামিলি প্লানিং-এর অনেক ব্যয় হবে।

ডেপুটি মিনিস্টার বললেন, আরে ভাই, আমি বাড়ির পোষা কুত্তাদের কথা বলছি না। ওদের ফ্যামিলি প্লানিং-এর কোন দরকার নেই। তা মানুষই হোক আর কুত্তাই হোক। ওরা যদি কোন বাড়িতে বা বাংলোতে থাকে তবে ওরা ফ্যামিলি প্লানিং-এর আওতায় পড়বে না। বাজারী কুত্তার কথা বলা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত সাধারণ কুত্তাদের সম্পর্কে···।

জয়েন্ট সেক্রেটারী বললেন, আমার মনে হয় আণ্ডার সেক্রেটারীকে ডাকলে ভালো হয়। আমি তো সিভিল লাইন্স-এ থাকি। উনি শহরে থাকেন। বাজারী কুত্তা সম্পর্কে ওনার ভালো জ্ঞান আছে।

আণ্ডার সেক্রেটারী কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে যখন পরিকল্পনা শুনলেন, তখন তিনি লাফিয়ে উঠলেন। কারণ জীবনে তিনি কয়েকবার কুত্তাদের বেদম পিটিয়েছেন, আর একবার শুধু এক হালুইকারের কুত্তা ওনার হাঁটুতে এমন জোরে কামড়িয়ে দিয়েছিল যে এখনও কাছ থেকে দেখলে সেই ঘায়ের দাগ চোখে পড়ে।

—আমার মনে হয় শুধু এই শহরেই দু-লাখ কুত্তা এবং দু-লাখ কুত্তি আছে। যদি প্রতিটি কুত্তি বছরে পাঁচটি করেও বাচ্চা দেয় আর তার তিনটি করে বাচ্চাও যদি বেঁচে থাকে তবে কুত্তার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমার বিশ্বাস, যদি এই হারে কুত্তার সংখ্যা বেড়ে চলে তবে দশ বছরের মধ্যে এই শহরে কুত্তার সংখ্যা মানুষের চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। সে জন্যে আমাদের এখনই জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একবার ভেবে দেখুন, এই লক্ষ লক্ষ কুত্তার জন্যে কত খাদ্য নষ্ট হচ্ছে। কত রকম অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। কত রাস্তা ঘাট নোংরা হচ্ছে। কত মানুষ হাইড্রোফোবিয়াতে মারা যাচ্ছে। স্যার কুত্তা মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু। আমার ধারণা, যদি কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করা যায় তবে মানুষের আর ফ্যামিলি প্লানিং-এর কোন প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রী মহোদয় তালি বাজিয়ে বললেন, হেয়ার। হেয়ার!! আমিও তাই ভাবছিলাম। এই ভাবনাকে সফল করার জন্যে আপনাদের কনফারেন্সে ডেকেছি। আমার মনে হয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে— আপনাদের এখন যত শিগ্গির সম্ভব কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং শুরু করে দিতে হবে। আর এইমাত্র আমি যা বললাম, অর্থাৎ যদি কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং সফল করতে হয় তবে মানুষের আর ফ্যামিলি প্লানিং-এর

কোন প্রয়োজনই থাকবে না। এই চিন্তা-ভাবনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আপনারা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করুন। আর এই কাজ আরম্ভ করার আগে একটা লিফলেট প্রকাশ করুন। লিফলেটের টাইটেল পেজের ওপর আমার একটি ছবি দিয়ে দিন!

ডেপুটি মিনিস্টার প্রস্তাব দিলেন, আর অন্য দিকে কুত্তার ছবি।

মিনিস্টার ডেপুটি মিনিস্টারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আ-হা···এর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমার ছবিই যথেষ্ট।

মিনিস্টার চিন্তা করতে করতে বললেন, শুধু লিফলেট প্রকাশ করলেই কোন কাজ হবে না, এর জন্যে আমাদের নতুন বাজেট তৈরী করতে হবে, নতুন স্টাফ রাখতে হবে। মানুষের ফ্যামিলি প্লানিং-এ যারা কাজ করছে, ওরা কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং-এ কাজ করতে পারবে না। কারণ মানুষ আর কুত্তার মধ্যে চাল-চলনে অনেক পার্থক্য আছে।

ডেপুটি মিনিস্টার বললেন, এখন অবশ্য এ পার্থক্যও নেই। দু জনেই তার থেকে দুর্বলকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে, আর নিজের থেকে তাগড়া দেখলে লেজ গুটিয়ে নেয়।

ডেপুটি মিনিস্টার অন্যকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, না ···না···, এর জন্যে আমাদের নতুন বাজেট তৈরী করতে হবে এবং নতুন স্টাফও রাখতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরী, এমন একজন লোককে এই পরিকল্পনার ইনচার্জ করতে হবে যে কুত্তা সম্পর্কে বিশেষ খবরা-খবর রাখে।

আণ্ডার সেক্রেটারী বললেন, আমার এক ভাইপো আছে।

জয়েণ্ট সেক্রেটারী বললেন, আমার এক ভাগ্নে আছে।

চীফ সেক্রেটারী বললেন, আমার এক নাতি আছে।

মন্ত্রী বললেন, আমার এক জামাই আছে।

আর কেউ কিছু বললেন না। মন্ত্রী সর্বশেষ সত্য বলে দিয়েছেন আর এই সত্যই সর্বদা জয়ী হয়। তাই পরের দিন থেকেই আমাকে চাকরীতে বহাল করা হল।

দুষ্টুজন বাজে কথা রটিয়ে বেড়ায়, মন্ত্রীর জামাই বলে আমার এই চাকরী হয়েছে। কিন্তু আসলে এই কাজের জন্যে আমিই ছিলাম উপযুক্ত মানুষ। প্রথমতঃ আমি জানোয়ারের ডাক্তার। জানোয়ারদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার যত জ্ঞান আছে অন্য কারো তা নেই। তাছাড়া আমি জানোয়ারদের ভাষাও জানি। কুত্তা এবং বানর থেকে আরম্ভ করে মশা

এবং মাছিদের বুলি আমি বুঝি—আর এ যুগে যখন ছেলে বাপের কথা বুঝতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কাজ কত কঠিন।

দু জন আর্দালি, দু জন খালাসি, দু জন কম্পাউণ্ডার এবং একটি ভ্রাম্যমান-অপারেশন গাড়ি নিয়ে আমি এক কুত্তাকে গলির মুখে ঘিরে ফেললাম। কুত্তাটা তখন এক কুত্তির পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল।

কুত্তাটি আমাদের খুব গভীর ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অবশেষে ও বুঝতে পারল এই লোকগুলির মধ্যে একমাত্র আমিই ওর কথা বুঝতে পারি। ও আমাকে বলল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে বললাম, তোমাকে অপারেশন করতে চাই।

—কেন?

—যাতে তুমি বাচ্চা পয়দা করতে না পার।

কুত্তা আমাকে বলল, আমার বাচ্চাতে তোমার কি?

আমি বললাম, ওদের জন্যে আমরা খাবার কোথা থেকে পাব? দেখ এই শহরে দু লাখ কুত্তা আছে। আগামী পাঁচ বছরে এই দু লাখ দশ লাখ হয়ে যাবে। বল, এই দশ লাখ কুত্তার খাবার জোগাড় আমরা কোথা থেকে করব? নিজের ছেলে-মেয়েদের পেটই আমরা ভরাতে পারছি না। তাই তোমার অপারেশন খুবই প্রয়োজন।

কুত্তা বলল, তবে কর। আমি তোমাকে কোথায় নিষেধ করেছি? যদি আমাদের বংশ ধ্বংস করে মানুষের বংশ সুরক্ষিত হয় তবে কুত্তারা মানুষের জন্যে নিজেদের কোরবানী দেবে। তুমি কিন্তু অযথা এই ঝামেলা পোহাচ্ছ। কুত্তাদের খতম করে দিয়ে তোমাদের কোনই ভালো হবে না।

—কেন?

—কুত্তাদের খতম করে দিলে বেড়ালের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বেড়াল কত তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। আর আমরা তো নিছকই কুত্তা। তোমাদের এঁটো খেয়ে দিন গুজরাই। বেড়াল তো সোজা তোমাদের কিচেনে ঢুকে দুধ খেয়ে পালায়। এসব জানো?

কুত্তা খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছিল। আমি যখন অফিসারদের কুত্তার কথাগুলো বললাম, তখন তাঁরা পরামর্শ করে রায় দিলেন কুত্তা খুব সঠিক কথা বলেছে। সুতরাং কুত্তার ফ্যামেলি প্লানিং বন্ধ রেখে বেড়ালের ওপর হামলা করতে হবে। আমাকে নতুন আদেশ এবং নতুন স্টাফ দেওয়া হল।

নতুন বাজেট তৈরী হল এবং প্যামপ্লেট বিলি করা হল। এর নাম ছিল —'বেড়ালের পরিবার পরিকল্পনা।'

আট দশ দিন চেষ্টা-চরিত্র করার পর একটি নাদুস-নুদুস বেড়ালকে ধরতে পারলাম। আমাকে দেখে বেড়ালটা অনেকক্ষণ ধরে গরগর করল, তারপর থাবা বের করে ঘুরতে লাগল। আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলল কি মশায়, আমাকে চেন না নাকি! শিক্ষা মন্ত্রীর পোষা বিড়াল আমার বেগম। চাকরী যদি খোয়াতে না চাও তবে আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও। না হলে নালিশ করে দেব।

আমার খুব রাগ হল। বললাম, বেড়াল মশাই, তুমি কি ভেবেছ, তোমার বৌ যদি কোন এক মন্ত্রীর বেড়াল হয়, আমিও এক মন্ত্রীর জামাই। আমি তোমার মন্ত্রীর থেকে কমজোরী নই যে তোমাকে ভয় পাব।

আমার জবাব শুনে হাড় বজ্জাত বেড়ালটা দমে গেল। আমাকে ও বলল, তবে বল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে আমার স্কিম বোঝালাম। স্কিম শুনে ও বলল, ও; তোমরা তবে মানুষের ফ্যামিলি প্ল্যানিং কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং-এ বদলে দিয়েছ। আর এখন কুত্তার ফ্যামিলি প্ল্যানিং বেড়ালের ফ্যামিলি প্লানিং-এ বদলাচ্ছ যাতে আমাদের বাচ্চারা তোমাদের খাবার না খেয়ে ফেলে।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি তাই বলতে চাচ্ছি।

আমি বজ্জাত বেড়ালটাকে খুব মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাতে লাগলাম, আমরা তোমার জান চাচ্ছি না, শুধু অপারেশন করতে চাই। আমরা অহিংসাবাদী। অপারেশনে তোমার মাত্র দু মিনিট কষ্ট হবে। এর পর আট দিন ধরে তোমাকে প্রতিদিন বাসি-মুখে নাস্তার আগে একটি করে ট্যাবলেট খেতে হবে।

বেড়াল বলল, খুব ভালো কথা। মানুষের জন সংখ্যার ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যত খতম করতে প্রস্তুত। কিন্তু মনে রেখ, তোমরা যদি আমাদের খতম কর, তবে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতও আগের চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভোগের মধ্যে পড়বে।

আমি ঘাবড়িয়ে বেড়ালকে জিজ্ঞেস করলাম, তা—তা কেমন করে?

ও বলল, আরে মূর্খ, ভাবছ না কেন এ দুনিয়াতে বেড়াল যদি না থাকে তবে ইঁদুরের কী হবে। আজও মানুষের খাদ্য চার ভাগের এক ভাগ ইঁদুর খেয়ে ফেলে। আর এর পরিবর্তে তারা তোমাদের কি দেয়?

প্লেগ আর দশ রকম অসুখ। একবার এ দিকটা ভাবো। যদি এই শহরে বেড়াল না থাকে তবে এক বৎসরেই এক কোটি ইদুর বেড়ে যাবে।

আমি ওর কথা স্বীকার করে নিয়ে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ।

—'যদি তোমরা জানোয়ারদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালু করতে চাও তবে প্রথমে ইদুর দিয়েই শুরু কর।' বেড়াল আমাকে বলল।

আমি এই বুদ্ধিমান বেড়ালের কথা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, খুব সত্যি, খুব সত্যি, আমি নিজেই তা ভাবছিলাম।

সুতরাং আমরা আবার স্কিম পাঠালাম। আবার নতুন স্টাফ রাখা হল, নতুন বাজেট পাশ হল এবং নতুন প্যামপ্লেট ছাপা হল। আমাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস হল এবার আমরা সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি। এখন সমস্ত কাজ পরিকল্পনানুযায়ী হবে এবং তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম এ কাজ খুব সহজ নয়। প্রথমে তো কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের গণ্ডগোল হল। যখন আমাদের স্টাফ অপারেশন করার জন্য ইদুর ধরতে গেল তখন আমরা বুঝতে পারলাম, শহরের তামাম ইদুর কর্পোরেশনের হাতের মুঠোর মধ্যে। আমাদের এর ওপর কোন দাবী নেই। কর্পোরেশন যতক্ষণ হুকুম না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী আমরা একটিও ইদুরকে অপারেশন করতে পারব না। আমরা খুব ক্রুদ্ধ হলাম, আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। কর্পোরেশনের লোকরা শহরের ইদুর আমাদের জিম্মায় দিতে রাজী নয়, ওরা ইদুরগুলোকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইছিল—অর্থাৎ এতদিন ধরে যা হয়ে আসছিল। আর আমরা—পরিবার পরিকল্পনার লোকেরা ইদুরদের জানে না মেরে অপারেশন করতে চাইছিলাম—যাতে আর ইদুর পয়দা না হয় এবং আমাদের পরিকল্পনাও সফল হয়।

দেড় বৎসর ধরে এই ঝগড়া-ঝাটি চলল। অবশেষে ওপর থেকে নির্দেশ এল, প্রথমে কর্পোরেশন ইদুরগুলোকে মেরে ফেলবে; তারপর আমাদের হাতে তুলে দেবে—যাতে আমরা তাদের অপারেশন করতে পারি। উপরওয়ালা দু পক্ষেরই কথা রেখেছে। কিন্তু মরা ইদুরের অপারেশন করা বৃথা। আর আমাদের পরিকল্পনাও খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ত। তাই আমাদের মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, বাবাজী ঝগড়া-ঝাটি করে কি লাভ? শহরের মেয়র নিজেদের লোক। এটা

ওনার প্রেস্টিজের ব্যাপার। শহরের ইঁদুর যদি উনি নিজের কাছে রাখতে চান, তবে রেখে দিন। তুমি গ্রামে যাও। শুনেছি গ্রামে ইঁদুর আছে।

আমি বললাম, থাকা তো উচিত। কিন্তু শহরের ইঁদুর থেকে ডবল, বড়-সড় এবং লড়াকু। এর জন্যে আমার আরও স্টাফ চাই।

—আরও স্টাফ নিয়ে নাও।

—গ্রামে যাওয়ার জন্যে দুটো জিপ চাই।

—দুটো জিপ নিয়ে নাও। কিন্তু এখন শহরের ইঁদুরের কথা ছেড়ে দাও, গ্রামের ইঁদুরের দিকে দৃষ্টি দাও।

আমি বললাম, শহরের ইঁদুর খুব ভদ্র। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা ওরা খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই গোঁয়ার, গেঁয়ো ইঁদুরদের বোঝানোর জন্যে আমাদের অনেক বেশী প্রপাগাণ্ডা করতে হবে।

মন্ত্রী খুব স্নেহের সঙ্গে আমাকে বললেন, নতুন আর একটা প্যামপ্লেট তুমি ছাপিয়ে নাও। এখন আমার একটা নতুন ছবি এসেছে।

একদিন যখন সব কিছু যোগাড়-যন্ত্র হয়ে গেল, তখন আমরা পেরেক আর কাঁটা নিয়ে ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা আরম্ভ করার জন্যে গ্রামে গেলাম। কিন্তু গ্রামের লোক আমাদের গেটের কাছে ঘেঁষতে দিল না। রাস্তার মাঝখানে লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল।

ওদের সর্দার বলল, ইঁদুরের ফ্যামিলি পরিকল্পনা! কী বেকুব! জানো না, ইঁদুর যদি আমাদের খেতে না থাকত তবে খেতের অর্ধেক শস্য পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলত? ইঁদুরইতো দিন-রাত আমাদের খেতে গর্ত খুঁড়ে পোকামাকড় খেয়ে ফেলে—আর আমাদের ফসল রক্ষা করে। আমরা ওদের পরিবার পরিকল্পনা হতে দেব না। কোন মতেই হতে দেব না। এখান থেকে চলে যাও।

আমি নিজের মনে মনে বললাম, কী অদ্ভুত সমস্যা! আমরা যদি কুত্তার প্ল্যানিং করি তবে বেড়ালের সংখ্যা বেড়ে যায়। বেড়ালের যদি প্ল্যানিং করি তবে ইঁদুর বেড়ে যায়। আর ইঁদুর খতম করলে পোকা-মাকড় বেড়ে যায়। কী, কী করা যায়?

আমরা গ্রাম থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু কারো ধমক বা ভয়ে কী আমাদের পরিকল্পনা বন্ধ থাকতে পারে! এ তো সরকারী কাজ, সরকারী কাজ হামেশাই চলতে থাকে। এক পরিকল্পনা সফল না হলে তার জায়গায় আর এক পরিকল্পনা হবে।

শুনেছি আমাদের দপ্তর খুব শীঘ্রই পোকা-মাকড়ের ফ্যামিলি প্লানিং-এর

কাজ শুরু করবে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আমাদের বিরোধীরা। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে। কৃষি বিভাগ এক জোরালো প্রোটেস্ট নোটে লিখেছে, রেশম পোকার পরিবার পরিকল্পনা তারা কখনই হতে দেবে না। বহু সরকারী অফিসার এই প্রোটেস্ট নোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বোধহয় এই ভেবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সরকারী অফিসাররাও এক ধরনের রেশম পোকা।

কিন্তু কারো ভয়ে বা···হুমকিতে কী আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কাজ বন্ধ থাকতে পারে? নতুন প্যামপ্লেট ছাপা হচ্ছে, নতুন বাজেট পাশ হয়েছে, নতুন স্টাফ রাখা হয়েছে। আর আমিও এ বৎসরে নিজের মাইনে বেশ বাড়িয়ে নিয়েছি—কারণ আমার ঘরে খুশীর দিন আসছে।

তিন গুণ্ডা

ওর নাম ছিল আব্দুল সামাদ। ভিণ্ডি বাজারে ও থাকত। শুধু এ জন্যেই অনেকে তাকে গুণ্ডা বলত—কিন্তু সে বেচারা সারা জীবনভর জানতে পারেনি যে সে একজন গুণ্ডা। অধিকাংশ মানুষই তার নিজের সম্পর্কে অল্পই জানতে পারে। যেমন লোকে তাকে খারাপ মনে করে, না ভালো? শরীফ না বদমাস? মেয়েদের নিজের মা-বোন ভাবে, না প্রেমিকা? তাকে বিশ্বাসী ভাবা হয়, না অবিশ্বাসী? শান্তির দুষমণ, না শান্তি-প্রিয়? নিজের সম্পর্কে সব না হলেও কিছু জানতে পারে, কিন্তু হতভাগা আব্দুল সামাদ আজ পর্যন্ত—তার কোমরে গুলি-লাগা পর্যন্ত সে জানতে পারেনি সে একজন গুণ্ডা। গুলি তার কীভাবে লাগে তা আপনাদের পরে বলব। এখন আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আব্দুল সামাদ একজন গুণ্ডা ছিল—উজির রেস্তোরার কাছে পাটকেল রঙ-এর যে দোতলা মঞ্জিল, যার সামনে ট্রামডিপো, সম্প্রতি যে ডিপো পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে সেখানে ফাইন আর্ট এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং প্রেস-এ সে কাজ করত। হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজদের মধ্যে পুরোনো শত্রুতার জন্যে যে লড়াই হয় তাতে হাজার হাজার হিন্দুস্তানীদের প্রাণ যায়, আর বেচারা ইংরেজদের কয়েক হাজার কার্তুজ মুফতে শেষ হয়ে যায়।

এই ফাইন আর্ট প্রেসে আব্দুল সামাদ কাজ করত। লিথোর ভারি ভারি পাথর মেসিনে তুলে দেওয়া ওর কাজ ছিল। অন্যান্য শ্রমিকরা যখন কষ্ট করে একটিই পাথর তুলত তখন আব্দুল সামাদ পানের পিক্ জোরে সামনের নর্দমায় ফেলে, মুখ খিস্তি করে, একসঙ্গে অনায়াসে দুটি পাথর তুলে নিত। যেন প্রিয় কোন বন্ধু সে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ম্যানেজারের টেবিলের পাশ কাটিয়ে, মুচকি হেসে, এক চোখ টিপে, মনে মনে ম্যানেজারকে এক খিস্তি দিয়ে পাথর দুটি মেশিনে লাগানোর জন্যে চলে যেত। এবং হেসে মেশিনম্যানকে বলত, 'নাও বাপু মিকে, ফলাফ জমাও।' মেশিন চালানোকে ও ফলাফ জমানো বলত। আসলে এ ছিল ওর একান্ত নিজস্ব ভাষা—যে ভাষায় সে তার জীবনের মহান কথাগুলি বলত।

যখন মালিক প্রেসে আসত তখন ও চুপি চুপি শ্রমিকদের বলত, 'শের এসেছে, শের এসেছে, দৌড়ে পালাও।' মালিক যখন থাকত না আর যখন ম্যানেজার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করত তখন ও বলত, 'আরে কাজ কর, শুয়োরের বাচ্চারা কাজ কর। দেখছ না ফেউ-এর বিবি কাঁদছে।' মাইনের দিনে সে বলত, 'আজ বেচারা চট্টম বাজাচ্ছে।' এই চট্টম বাজানো কোন্ ভাষায় শব্দ? কোথা থেকে এসেছে? কোত্থেকেই বা ও শিখেছে? কেউই জানে না। এ ছিল আব্দুল সামাদের নিজস্ব ভাষা। কে ওকে এই ভাষায় কথা-বলা বন্ধ করতে পারে? ভাষাগত ভাবে ওর সবচেয়ে বেশী বিদ্যা ছিল গালি-গালাজ। আমি আজ পর্যন্ত এমন কোন মানুষ দেখিনি যে আব্দুল সামাদের থেকে বেশী ভালো গালি-গালাজ দিতে পারত—'তোর মার দুধে হুকুমের এক্কা।' এই ধরনের গালি শুধু কবিই দিতে পারে। আর গালির ব্যাপারে আব্দুল সামাদ ছিল একজন কবি —একজন শিল্পী। ও যখন গালি দিত তখন ওর স্বরে ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় এমন তীব্র গতি থাকত যে, তাকে আমার ভারতবর্ষের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞের মতো মনে হত—যাঁরা কথা বেশী বলেন, কাজ কম করেন। কিন্তু আব্দুল সামাদের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল যে, কথাও সে বেশী বলত এবং কাজও খুব ভালো করত। খিস্তি-খাস্তার জন্যে ওর প্রেসের ম্যানেজার ওকে পছন্দ করত না, কিন্তু কাজকর্ম ও খুব ভালো করত। তাই প্রেস থেকে ওকে তাড়াতে চায়নি। নিজেও দেখেছি, এ এক বিচিত্র ব্যাপার যে, যত গুণ্ডা আছে, কাজকর্মে তারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সব চেয়ে ভালো মজুরও গুণ্ডা হয়। কী আশ্চর্য ব্যাপার। তাই না?

আব্দুল সামাদ ছিল একজন ভালো শ্রমিক, যদি কথা বেশী না বলত, খিস্তি-খাস্তা না করত এবং অযথা না হাসত, তবে ওর মতো মানুষ আর দুটি ছিল না। হাঁ, ও সবসময় পান খেত, ফলে ওর বড় বড় দাঁতগুলো আরও বিশ্রী দেখাত। খিস্তিতে ও এমন চোস্ত ছিল যে বড় বড় লেখকরাও সারা জীবনভর পরিশ্রম করে এমন ভাষা খুঁজে পেত না। আর হাসি? হাঁ, ওর হাসি ছিল সবচেয়ে বিচিত্র চিজ। ওর হিঃ হিঃ এবং খিকখিক হাসি প্রেসের অন্ধকারময় দালান এবং বিশেষ করে যে ঘরে সে কাজ করত তার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। তার এই হাসি সেই পাহাড়কে মনে করিয়ে দিত যেখানে সনোবনের জঙ্গল আছে—মনে করিয়ে দিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যে প্রান্তরে মাইলের পর মাইল গম জন্মায়, নক্ষত্র-খচিত সেই রাত্রি, যে নক্ষত্র-খচিত রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ত

আর রাত্রির রাণী এই অন্তরীক্ষ পর্যন্ত নিজের চুল ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যের কিরণের প্রতীক্ষা করত। তার এই হাসি যেন সমুদ্রের বুক চিরে বেরিয়ে আসত —আর সারা পৃথিবীর ওপর ঢেউ খেলে খেলে চলে যেত; মনে হত এ হাসি কোন মানুষের নয়—দেবতার। রূঢ়, দুর্গন্ধময় প্রেসের এই অন্ধকারময় চার দেওয়ালের সীমানার মধ্যে এই হাসি ছিল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আব্দুল সামাদ প্রায়ই হাসত, গালিগালাজ দিত, আর ম্যানেজারের সামনে দিয়ে লিথোর পাথর নিয়ে যেত 'গুণ্ডা কোথাকার!'

আমি যখন প্রথম ফাইন আর্ট প্রেসে তাকে দেখি তখন তার প্রতি আমার মনে এক প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব উৎপন্ন হয়। জে. জে. হাসপাতালের স্টাফরা নাচের এক জলসার আয়োজন করেছিল। আমি সেই জলসার এক প্রোগ্রাম ছাপানোর জন্যে প্রেসে এসেছিলাম। এখানেই আব্দুল সামাদকে আমি প্রথম দেখি। ও তখন বেশ ডাটের সঙ্গে কোমরে হাত রেখে বলছিল, 'মনিজার সাহাব, লিথোর পাথর আমার কাছ থেকে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।'

—'কেমন করে ভেঙ্গে গিয়েছে?'

—'তা কেমন করে বলব? হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়ে দু'টুকরা হয়ে গেল। এই শালা পাথরের আজকেই ভাঙ্গার কথা ছিল। দু'সাল হয়ে গেল আমি এই হারামী প্রেসে কাজ করছি। কোনদিন এমন হয় নি।' এই বলে সে তার মাথা চুলকাতে লাগল এবং মাথা থেকে এক উকুন বের করে তার নখে পিসতে পিসতে বলল, 'ধুত্তোরি, উকুনের মুখে শুয়োরের কাবাব।'

ম্যানেজার বলল, 'ভালোভাবে কথা বল।'

'ভালো ভাবেই তো কথা বলছি, জনাব মনিজার সাহাব। লিথোর পাথর আমার হাত থেকে ভেঙ্গেছে। মাফ চাইছি।' বলে ও হাসতে লাগল, মাফ চাওয়াটাই ওর কাছে অদ্ভুত লাগছে। ওর দাঁত, ওর মাড়ি এমনকি ওর গলা এবং তালু পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম, কারণ ওর শরীর থেকে এক অদ্ভুত ধরনের গন্ধ আসছিল। প্রতিটি গুণ্ডার শরীর থেকে গন্ধ আসে—মাটির গন্ধ, ঘামের গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ। আর যদিও ওর গায়ে বিশ্রী গন্ধ ছিল কিন্তু ওর হৃদয় ছিল সুন্দর। ওর ছোট-ছোট কালো চঞ্চল চোখ ভুরুর নীচে ঝকমক করছিল। সেই চোখে কোন বদ গন্ধ ছিল না। দশ তারিখে সে যখন মাইনে পেত তখন সে ম্যানেজারকে কৃপার চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখত। এমন চোখে সে তাকাত যে চোখে দয়ালুতা ছাড়াও বিস্ময় থাকত। আর সেই দৃষ্টিতে এমন ভাব থাকত, যেন বলছে, "তুই ম্যানেজার না, আমার ভাই। আমরা দু'জনে মানুষ।" ওর এই ভাবনাতে কোন বদগন্ধ ছিল না, আর ওর হাসি—ওর নোংরা হাসিতে প্রেসের কালি এবং মেশিনের তেল লাগানো ছিল। এই হাসিতেও কোন বদগন্ধ ছিল না, কিন্তু তার গায়ে বিশ্রী গন্ধ ছিল। ওর দাড়ি ছিল নোংরা। ওর হাতের মাংসপেশী ছিল ফোলা, গালিগালাজ করত আর সব সময় লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকত। ও ছিল গুণ্ডা, স্রেফ গুণ্ডা। ম্যানেজার যখন ওকে এভাবে হেসে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখল—তাও আবার এক বাইরের মানুষের সামনে, তখন তার মনে ক্রোধের এক তুফান বয়ে গেল। সে কাঠের একটা রুল দিয়ে খুব জোরে টেবিলের ওপর আঘাত করল এবং আব্দুল সামাদকে চীৎকার করে গালি দিয়ে বলল, সে কখনও তাকে ক্ষমা করবে না 'লিথোর পাথর খুব দামী! তুমি জানো না পাথর জার্মানের বেবরিয়া থেকে আসে। তুমি কি জানো না, এখন এই পাথর অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়, কারণ জার্মান যুদ্ধে হেরে গিয়েছে। তুমি জানো না, আজকাল পাথর পাওয়া কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

আব্দুল সামাদ উত্তর দিল, 'আমি সব জানি। পাথর তো হিন্দুস্থানেও পাওয়া যায়—এত পাথর পাওয়া যায় যে একটা গোটা সেনাবাহিনীকে পাথর মেরে মেরে হিন্দুস্থান থেকে হটানো যেতে পারে। পাথর তো পাওয়া যায় মনিজার সাহাব, কিন্তু রুটি পাওয়া যায় না। গালি ছাড়া, বেইজ্জতি ছাড়া, মনিজার সাহাব আপনি তো জানেন, গালি দিয়ে আপনি আমার মোকাবিলা করতে পারবেন না···' এই বলে আব্দুল সামাদ ম্যানেজারের মার দুধে যখন হুকুমের এক্কা বসাতে লাগল তখন প্রেসের সমস্ত কর্মীরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ম্যানেজার খুব কষ্টে নিজের জান বাঁচাল।

আব্দুল সামাদ বলল, 'নিজের পাথর নিজের ঘরে রাখ। আব্দুল সামাদ আব্দুল সামাদ। ও চট্টম বস্তা হবে না। পাথর ভেঙ্গে গিয়েছে তো কি করব? আমার চট্টম আর চতুড় (শিঙ ও পাখা) কেটে কি প্রেসে রেখে দেব! আবার গালি দিচ্ছ! আমি কাজ করব না। এই শালা প্রেসে আর কাজ করব না। আমি এখনই চলে যাচ্ছি···এখনই।' আব্দুল সামাদ অনেকক্ষণ ধরে একটানা এমনি বলে চলল, কিন্তু প্রেস ছেড়ে চলে গেল না। এই ব্যাপারে ওর নীতি ইংরেজদের সঙ্গে মেলে —যারা সব সময় ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখায় অথচ গ্যাট

হয়ে বসে থাকে। ও নিজের থেকে গেল না, কিন্তু পর দিন ম্যানেজার মালিককে বলে ওকে প্রেস থেকে বের করে দিল। এ ঘটনা ঘটেছিল দাঙ্গার দু'দিন আগে। আমি দাঙ্গার আগের দিন দেখলাম আব্দুল সামাদ ভিণ্ডি বাজারের বিভিন্ন রাস্তায় অন্যান্য গুণ্ডাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে চীৎকার করছে এবং হরতাল করাচ্ছে। এক জায়গায় মুসলমানদের একজন খুব বড় নেতা চুন্দ্রীগর ভাষণ দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, আমাদের এই হরতালে এই দাঙ্গায় এই ঝগড়ায় অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ সব কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র···। ঐ সময় কিন্তু আব্দুল সামাদ আর তার গুণ্ডা বন্ধুরা হৈ-হল্লা করে এই শান্তিপ্রিয় নেতার ভাষণ বন্ধ করে দেয় এবং 'জয়হিন্দ' এবং 'হিন্দুস্তানী জাহাজীদের হরতাল জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে ঐ নেতাকে জনসভা থেকে বের করে দেয়। আমি এও শুনেছিলাম ওরা হরতাল করে, ট্রাম এবং ট্রাম ডিপো জ্বালিয়ে দেয়। এ সমস্ত কিছুতেই আব্দুল সামাদ শামিল হয়েছিল, অবশ্য এ সব আমি পরে জানতে পারি। চুন্দ্রীগরের মিটিং-এর পরে আব্দুল সামাদকে আমি জে. জে. হাসপাতালে দেখি। গুলি ওর পিঠে—ঠিক কোমরের পাশে লাগে এবং পেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোমরের পাশে একটা ছোট ছিদ্র ছিল—যেখান দিয়ে গুলি ভেতরে ঢোকে আর পেটে এক বড় ঘা তৈরী করেছিল, যে ঘা হাজার ছর্রায় তৈরী হয়েছিল। এই কার্তুজ দমদমে তৈরী কার্তুজ নয়—যে কার্তুজ গত বিদ্রোহের সময় এসেছিল। এ ছিল এক নতুন কার্তুজ। নতুন এবং সাংঘাতিক, যা শরীরের ভিতর গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর শয়ে শয়ে ছোট ছোট ঘা তৈরী করতে পারে। মারতেই যদি হয় তবে মানুষকে এক সাধারণ কার্তুজ দিয়ে মারা যেতে পারে, কিন্তু গুণ্ডাদের জন্যে এই ধরনের কার্তুজের প্রয়োজন ছিল। আমাদের এখানে এই ধরনের কার্তুজ শুয়োর শিকারের জন্যে ব্যবহার হয়। গুণ্ডা তো শুয়োরের চেয়েও অধম। ভালোই হয়েছে যে আব্দুল সামাদ মারা গিয়েছে।

আব্দুল সামাদ মারা গিয়েছিল আর ওর শব আমার সামনে পড়েছিল। বয়স চব্বিশ বৎসর, জাতে রাজপুত, ধর্মে মুসলমান, অবিবাহিত, চোখের চমক মৃত, ঠোঁটের হাসি মৃত, প্রাণওষ্ঠাগত গালি মৃত! সমস্ত কিছুরই টুটি চেপে ধরা হয়েছিল, আর ও আমার সামনে হাত ছড়িয়ে, মুখ হাঁ করে মৃত পড়েছিল—এক অন্ধকারময় ভবিষ্যত, এক স্তব্ধ গালি। আর ওর মা বুক চাপড়িয়ে চীৎকার করে হাসপাতালের বাইরে টেন্টে-বসা সিপাইদের ইঙ্গিত করে বলছিল, আমার ছেলে এই পুলিশদের কি

করেছে ? আমার ছেলে কেন মারা গিয়েছে ? কেন গুলি লেগেছে ? ও কার কি ক্ষতি করেছে ? ও তো গলিতে এক ছোট এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে—যে পালাচ্ছিল তাকে বাঁচানোর জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল, আর তখন কেউ ওর পিঠে গুলি মারে, কিন্তু বাচ্চা মেয়েটি বেঁচে যায়। আর আমার জোয়ান ছেলে ! ডাক্তার ! আমার ছেলে আর এই দুনিয়াতে নেই। ওকে কেন মারা হল ? ডাক্তার, খোদার নামে বল, ওকে কেন মারা হল ?

আমি খুব ধীরে বললাম, 'মারা হয়েছে কারণ ও একজন গুণ্ডা। তারপর ওর মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে অন্য শবের দিকে তাকালাম।

দ্বিতীয় গুণ্ডার সঙ্গে আমার এক বেনিয়ার বাড়িতে পরিচয় হয়। সেনঢস্ট রোড—যাকে গুণ্ডারা 'সওাস রোড' বলে, সেখানে বড় বড় বেনিয়ারা থাকে। পদমসি সেঠজীও থাকে। পদমসি সেঠজী জে. জে. হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ তার কারণ একশ' টাকার ওপর তিনি একশ' বিশ টাকা সুদ নেন, আর সমস্ত কিছুই তিনি নিঃশব্দে সারেন। পদমসির চেহারা শিশুর মতো ভোলো-ভালো। তাঁর হাসিটি যেন চিনি-তে চোবানো, এবং কণ্ট্রোল সত্ত্বেও তার কথাবার্তার ঢংও চিনির মতো এত মিষ্টি যে মনে হত তিনি কালোবাজার থেকে তা সংগ্রহ করেছেন। পদমসি সেঠ আমার অন্তরঙ্গ ভালো বন্ধুদের মধ্যে একজন, কারণ সব সময়েই আমার ঋণের প্রয়োজন হয়—আর যে বন্ধু আমাকে ধার দেয় না তার আমি খাতিরদারি রাখি না। পদমসি সেঠ বেশী সুদ আমার কাছ থেকে নিতেন না। একশ'র ওপর শুধু একশ' বিশ টাকা, তাও আবার বিনা জামিনে। আপনারাই বলুন এর চেয়ে ভালো সওদা ভারতের বাইরে আর কোথায় হতে পারে ? আজও আমি যখন গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সেনঢস্ট রোডে পদমসি সেঠের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন উনি আমাকে স্বাগত জানালেন। উনি আমাকে কখনও ফেরাতেন না, সর্বদাই টাকা দিয়ে দিতেন। উনি জানতেন আমি জে. জে হাসপাতালের ডাক্তার, আমার টাকার প্রয়োজন থাকে, আর সুদ শুদ্ধ আমি তা ফেরতও দিই। আমার প্রেমের কথা উনি খুব ভালো ভাবেই জানেন। যে নার্সের সঙ্গে আমার প্রেম সেই নার্সকেও উনি জানেন—সেই নার্স এত সুন্দরী আর অমূল্য যে তার জন্যে একজন অবিবাহিত যুবক ডাক্তারকে একশ' বিশ টাকা সুদ দিতে হয়। একে তো ভারতে

প্রেম খুব দামী জিনিস আর, দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র, প্রেমকে আইনের দুষমন করে রেখেছে। আপনি কোন মানুষকে হত্যা করতে পারেন কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম করতে পারেন না। আপনি যদি কোন মেয়েকে বলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, 'কেন তোমার বাড়িতে মা-বোন নেই?' এ দেশে ভালোবাসা যেন মা-বোন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এরপরেও যদি কেউ প্রেম করতে সাহসী হয়, তবে তাকে জুতো খেতে হয়, পিটুনি খায় বা গুলির শিকার হয়। তাই ভারতবর্ষ প্রেমের জায়গা নয়, ঘৃণার জায়গা —এখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না, ঘৃণা করে। মানুষ রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্র মানুষকে, মা-বাবা ছেলেকে, ছেলে মা-বাবাকে ঘৃণা করে। বাড়িতে রাষ্ট্রে কারখানায় অফিসে সব জায়গায় ঘৃণার রাজত্ব। কংগ্রেস লীগ সোস্যালিস্ট একজন আরেকজনের সঙ্গে কামড়া কামড়ি করে। ওদের একজনের প্রতি আরেকজনের যত ঘৃণা আছে তত ঘৃণা বিদেশী সরকারের প্রতি নেই —যে বিদেশী সরকারের তারা সবাই দাস। ভারতবর্ষ ঘৃণার এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি, —কোথাও কোথাও সেখানে ফুলের কেয়ারী দেখা যায়। আর এই ফুলের কেয়ারি লাগিয়েছে নার্সরা, দেহাতি মেয়েরা, ফিল্ম স্টার আর অহিংসার সমর্থকরা। না জানি কেন চার দিকে শুধু ঘৃণার ধু-ধু বালিয়ারী। বোধ হয় এই দেশের বায়ু মণ্ডলই এমন। বেচারা পদমসি সেঠও এই বায়ু মণ্ডলে শ্বাস নেন—আর তাই তিনি প্রতিটি মানুষকে ঘৃণা করেন। এই ঘৃণাতে যদি আর কেউ সামিল হয়ে না থাকে তবে সে তার ছোট মেয়ে শান্তা। শান্তা রোগা পাতলা নয় বৎসরের এক মেয়ে—যাকে ঈশ্বর না দিয়েছে সৌন্দর্য, না ভিটামিন। সরু সরু পা, ময়লা ফ্রকে অনাবৃত সরু সরু হাত, শুকনো মুখ—যে মুখের পিপাসা কখনও ফুরাবে না। সব সময় চীৎকার করছে, আর মুখে মিষ্টি পুরছে। এমন জংলি কুৎসিত বদমেজাজী মেয়ে যে কি বলব! দেখেই বুক ধড়াস করে ওঠে। বাচ্চাদের আমি এমনি ঘৃণা করি। কারণ সব সময়েই তারা না বুঝে চীৎকার করে। কখনও চেয়ার ধরে হেলাচ্ছে, কখনও বা থার্মোমিটারের ওপর হাত ছুঁড়ছে তো, কখনও দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছে। আর শান্তা এমনই মেয়ে যে এক দণ্ডের জন্যেও স্থির হয়ে থাকে না। ওর গলার স্বরও যেমন তীব্র তেমনি কর্কশ, আর সব সময় ওর ঠোঁট দিয়ে জিলেপির রস গড়ায়। আর ওর বাবা আমাকে একশ' টাকা দিয়ে একশ' বিশ টাকা সুদ নেয়। আপনি এই মেয়ের প্রতি

আমার ভালোবাসা এবং করুণা অনুমান করে নিতে পারেন। সেদিন যখন আমি সেখানে গেলাম তখন ঘরে শান্তা ছিল—সে এই ঘর থেকে ঐ ঘরে, ঐ ঘর থেকে এ ঘরে হৈ-হল্লা আর ছুটা ছুটি করছিল আর জিলিপি খাচ্ছিল। পদমসি সেঠ ওকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অন্য ঘরে যা। দেখছিস না ডাক্তান সাহেব এসেছেন।' শান্তা কাঁদো-কাঁদো মুখে মনে মনে আমাকে গালি দিয়ে, নালিশ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর বাবা ওকে যেতে দেখে আবার বললেন, 'বাইরে যেন যাস না। বাইরে দাঙ্গা হচ্ছে। তারপর তিনি খাতা খুলতে খুলতে, রেশমের চেয়েও মোলায়েম স্বরে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনার কত টাকা চাই? আমি বললাম, 'আজ তো আমি আপনাকে প্রথম কিস্তির টাকা দিতে এসেছি। এখন আমার টাকার দরকার নেই, কারণ নার্সের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে, আমার প্রেম এখানেই শেষ।' উনি হেসে বললেন, 'রসিদ কেটে দেব?' আমি বললাম, 'হু", নিয়ে আসুন, আমিও সই করে দিচ্ছি।' সুতরাং রসিদ কাটা হয়ে গেল, সইও হল এবং স্ট্যাম্প কাগজ আমাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। আমি সিগারেট ধরালাম, উনি বিড়ি। তারপর নানান গল্প হতে লাগল। তুলার বাজার মন্দা, সোনা-চাঁদির ব্যবসার ধান্ধায় আছি, স্টক এক্সচেঞ্জ খুব বাজে, গলায় ইংরেজদের ফাঁসীর দড়ি ডাক্তার সাহেব, রামজী আপনার ভালো করুক, আমি বেশ ফেঁসে গিয়েছি। এই স্টার্লিং ব্যালেন্স……।
আমি বললাম, জী হাঁ, ব্যাপারটা যদি স্টার্লিং ব্যালেন্স পর্যন্তই থাকত তবে ভালো ছিল, কিন্তু সেঠজী, ওরা স্টার্লিং ব্যালেন্সের আরও এক ভাগ বের করেছে, যাকে কেরাট্রিড আর্টারি বলে।

—'কেরাট্রিড আর্টারি কি?

'সেঠজী কেরাট্রিড আর্টারির সঙ্গে এন্টি-[illegible]বেন-হাইপোর জার্মানী সাইডস লাগিয়ে তাকে এন্টিসেপটিক করেছে। বাপরে বাপ!'

সেঠজী চমকে উঠে বললেন, 'তবে ব্যাপারটাতো খুব গুরুতর।'

আমি বললাম, হাঁ, ইংরেজী পত্রিকায় সব বের হয়েছে, আপনি পড়েননি?

সেঠজী বললেন, জী, না আমি জন্মভূমি পড়ি। ভালোই হল, আপনি বললেন। একদিকে তো দাঙ্গা হচ্ছে, অন্যদিকে জাহজীরা হরতাল করেছে। গুণ্ডামী রাহাজানি চলছে। আর আপনি আমাকে এন্টিসেপটিকের কথা বলে দিলেন। ডাক্তার সাহেব, কালোবাজারে আমি যত টাকা চেপে রেখেছি, সবই আজ আমি বের করে আনছি।'

এইটুকু বলে সেঠজী পাশ ফিরে বসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নীচে কয়েকবার গুলি চালানোর শব্দ পাওয়া গেল। উনি বললেন, 'দেখুন, হরতাল করলে এমন হবেই। গুণ্ডা-বদমাশরা ধনীদের লুট করতে চায়। ডাক্তার সাহেব, কলিযুগ এসে গিয়েছে। শহরকে তছনছ করতে চায়। ডাক্তার সাহেব, কলিযুগ এসে গিয়েছে,—কলিযুগ। এই পৃথিবীতে আর ধর্মের বীজ নেই।

আমি বললাম, 'আপনি সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছেন।'

ঠিক এই সময় আবার গুলির আওয়াজ সোনা গেল এবং গলি থেকে কান্না ও চীৎকারের শব্দ ভেসে আসতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চদের চীৎকার শুনে আমরা ছুটে জানালার কাছে গেলাম, ঝুঁকে ঝুঁকে নীচে দেখতে লাগলাম। সেঠজী চীৎকার করে উঠলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নীচে নেমে গেলেন। আমিও তার পেছন পেছন ছুটলাম। তেমন কোন বিশেষ ব্যাপার ছিল না। গলির বাচ্চারা পুলিসদের সঙ্গে রোজই কানামাছি খেলত। বাচ্চারা লুকিয়ে গলির অন্যদিকে গিয়ে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দিত আর ছোট ছোট কাঁকড় ছুঁড়ে মারত। পুলিসরা যখন ওদের ভয় দেখাত এবং ওদের পেছনে ধাওয়া করত তখন বাচ্চারা ছুটে হাসতে হাসতে এবং তালি বাজিয়ে গলির অন্যদিকে গিয়ে একই খেলা খেলত। খুবই মজার খেলা ছিল, বাচ্চারা সারাদিন ধরে এই খেলাই খেলত। অন্য কোন দেশ হলে বাচ্চাদের এই তামাসাকে খেলা বলেই মনে করা হত। খুব বেশী যদি হত তবে কোন সিপাই চঞ্চল বাচ্চাদের কান মলে দিত, 'দেখ এমন আর কর না।' ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এই দেশ পিতা আদমের সময় থেকেই অন্যরকম। এই দেশে প্রেমের কোন স্থান নেই, ঘৃণার রাজত্ব। তাই পুলিশ মিলিটারীকে তাদের সাহায্যের জন্যে ডেকে আনল। সেনটস্ট রোডে কানামাছির যে মজার খেলা আরম্ভ হয়েছিল তা ইতিহাস চিরদিন স্মরণ করবে। বাচ্চারা যখন নিয়মানুসারে চীৎকার করে এবং কাঁকড় ছুঁড়তে ছুঁড়তে গলির মাথায় পৌঁছল তাদের সেখানে গুলি করে স্বাগত জানানো হল, ওরা যখন ওখান থেকে পালিয়ে গলির অন্য মাথায় পৌঁছুল তখন সেখানেও গুলি চালিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হল। চিনির গুলিতে নয়, কার্তুজের গুলিতে। বাচ্চারা যখন আহত হয়ে পালাল এবং গড়িয়ে পড়তে পড়তে গলির অন্য আর একদিকে ছুটল সেখানেও কানামাছি খেলুড়ে সিপাইরা বসেছিল। এক নাগাড়ে গুলি চলল আর কিছুক্ষণের

মধ্যেই নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। চারিদিক শুধু স্তব্ধতা আর স্তব্ধতা। খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বহু মানুষ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল আর নিজেদের আহত ও নিহত বাচ্চাদের তুলতে লাগল। মা বোন, বাবা-ভাই বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে লাগল। পদমসি সেঠ গলা ছেড়ে কাঁদছিল, 'সান্তা। আমি তোকে বাইরে যেতে মানা করেছিলাম না। বলেছিলাম বাইরে যাস্ না...' ও টিয়া পাখির মতো এক নাগাড়ে বলে চলছিল এবং হাত কচলাচ্ছিল। আর সেই কুৎসিত গুজরাটি মেয়েটি 'জয়হিন্দ' বলতে বলতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিল। তার মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। ওর মুখ থেকে, ওর হাত থেকে, ওর বুক থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। ওর সারা শরীর রক্তের রঙে রাঙা হয়ে গিয়েছিল। পাটকেলে রঙ, লাল ওড়না। মাথায় সিঁদুর। নয় বৎসরের বাচ্চা মেয়ের আজ বিয়ে হচ্ছিল, ছোট্ট অবোধ কনে। এই রঙ যেন ওর কুরূপকে ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাহু সুডোল এবং ভরাট ছিল, ওর বুক ছিল মাতৃত্বের স্তনে ভরাট। ওহে অবিবাহিত কনে আজ তোর সিঁথিতে শহীদের রক্ত। তোর বড় বড় চোখে উজাড় দেশের সোহাগ। পিপাসার্ত ঠোটে 'জয়হিন্দ'-এর সঙ্গীত। আজ তুই তোর দেশকে নিজের জীবনের শেষ কিস্তি দিয়ে দিয়েছিস—নিজের রক্ত দিয়ে রসিদ লিখেছিস। হে ছোট্ট গুণ্ডা মেয়ে, আজ তোর মৃত্যুর বোঝা আমাদের সবার ওপর, জানি না আমি কি করব? কোন দিকে তাকাব? কার কথা বলব? কাকে ডাকব? কি চিন্তা করব? কেন মাটি পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে, তোর দেশের বড় বড় মানুষরা তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোর রক্ত প্রতিকারের জন্য চীৎকার করছে। গুজরাটি মেয়েটি মারা গিয়েছিল। একবার-দু'বার হিচকি তুলল, 'জয়হিন্দ'-এর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর সঙ্গীত, আর ওর রক্ত আগুনের মতো ফরাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পরিবেশ এমন নিস্তব্ধ, যেন সারা বায়ুমণ্ডল কেঁদে চলেছে। সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন হাজার হাজার বর্শা একসঙ্গে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাটি মেয়েটি মারা গিয়েছিল, মারা গিয়েছিল ওর ভাবি স্বামী, ওর সুন্দর বাচ্চা, ওর জীবন, ওর রচনা আর সমস্ত সৌন্দর্য।

কি হওয়া উচিত? কি করা উচিত? কিছুই আমি জানি না। শুধু এইটুকুই জানি এই সঙ্গীত, এই ধ্বনি, এই লয়—যাতে ঐ মেয়েটির রক্ত গোলানো ছিল তা কখনও মরে যাবে না। আমি এইটুকুই জানি যখন কোন সঙ্গীত কোন চীৎকার, কোন হাসি, কোন রক্ত দিয়ে রচিত

হয় তখন তার মৃত্যু নেই। তা তখন গলায় ফাঁসীর দড়ি হয়ে ঝোলে, হৃদয়ে দগদগে ঘা হয়ে থাকে, আত্মায় কাঁটা হয়ে বেঁধে। ওকে গুণ্ডা বলা সহজ কিন্তু ওকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় যে গুণ্ডার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় সে ছিল একজন শিখ। বেঁচে থাকতে নয়, মৃত্যুর পরে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। পরনে ছিল এক সালোয়ার আর এক পাতলা ডোরাকাটা কামিজ, ওর সারা শরীরে গুলির চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। ওর সুডোল মুখে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না, আর ওর ছোট ছোট দাড়ি ছিল রেশমের মতো নরম। ওর টানা টানা চোখ দু'টি ছিল সুন্দর আর তাতে ছিল পৃথিবীর স্নিগ্ধতা। ওর চেহারা দেখে জাঠদের সেই গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল যেখানে মাটি সোনা ফলায়, যেখানে সোনার প্রতিমা তার কালো কালো চোখে প্রেমের নেশা নিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে পরদেশীকে জল খাওয়ায়; যেখানে নদীর কিনারে লম্বা লম্বা ঘাস ঝুলে থাকে, যেখানে নদীর পাড়ে গমের দানা মাথা নাড়ে। আর তার ওপরে নীল আকাশ—হাসি-ভরা আকাশ আরও উঁচুতে উঠে যায়। হারিয়ে-যাওয়া এক স্বপ্ন, এক অনুভূতিময় বাস্তবতা, আচমকা প্রসন্নতা, এ সমস্ত কিছুই সেই শিখ যুবকটির চেহারায় দেখা যাচ্ছিল। ওর জামার পকেটে ছিল এক অসমাপ্ত চিঠি। হয়তো এই চিঠি ও ভোরে লিখতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু আর শেষ করতে পারেনি। কারণ ওর জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল—ওর চোখের জ্যোতি, ওর ঠোঁটের বাক-শক্তি, ওর বাহুর তাগত ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গুণ্ডা মারা গিয়েছিল বলে আমার দু:খ ছিল না, দুঃখ ছিল ঐ অসমাপ্ত চিঠির জন্যে। এই চিঠি গুরুমুখী ভাষায় লেখা ছিল। এর তর্জমা আমি করতে পারব না। কারো আত্মার তর্জমা কে কোন্‌দিন করতে পেরেছে? ভালো-মন্দ যেমন হোক ঐ কণ্ঠস্বরের, ঐ ভাষার, ওর ব্যক্তিত্বের ঢং-এর আমি তর্জমা করছি:

"মা আমার শতশ্রী অকাল। বাহগুরুর কৃপায় এখানে কুশলে আছি, বাহগুরু মহরাজের কৃপায় তোমার কুশল সংবাদ খুব শীগগির আশা করছি। আমার এখনও কোন ঠিকানা নেই, কাজ-কর্মও পাইনি। বোম্বাই শহরে দাঙ্গা হচ্ছে এবং হিন্দু-মুসলমান এক জোট হয়ে আছে। বাহগুরুর কৃপায় কোন চিন্তা কোর না। তোমার ছেলে নিশ্চয়ই চাকরী পাবে।

তোমাকে টাকা পাঠাবে। আমার সুন্দর বোনকে বিয়ে দেব আর ঐ শালা শুয়োরের বাচ্চা বেনিয়ার সুদও দিয়ে দেব। মা আমার, আমাকে ক্ষমা কর। বেনিয়া গুলালচন্দর নাম মনে আসতেই তোমার ছেলের ক্রোধ এসে যায়। এখানে আমি এখনও ড্রাইভার কৃপালসিংহ-এর লরিতে শুই, আর প্রতিদিন ওর লরি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিই। জগত সিংকে বলবে ওর বোন বন্তোর বিয়ে যেন মনোহর সিংহের সঙ্গে না দেয়, দিলে ওকে জানে মেরে ফেলব। আমার চাকরী হয়ে গেলে আমি নিজেই এসে বন্তোকে নিয়ে পালিয়ে আসব। আমার মা, ও তোমার ছেলের বউ··· ভালো বউ হয়েই ও তোমার সেবা করবে······"

এর পরে চিঠিতে আর কিছু লেখা ছিল না। হাঁ, যারা এই শিখ যুবকের লাশ হাসপাতালে এনেছিল তারা বলছিল এই যুবক ব্যারিকেড লড়াই-এ নিজের জীবন দান করেছে। গ্রাণ্ড রোডের মিছিলে ও 'পাগড়িসম্ভাল জট্টা' (জাঠ তোমার পাগড়ি সামলাও) গান গাইছিল এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল। ওর যখন গুলি লাগল তখনও ও গেয়ে চলেছিল। ওর হাতে কংগ্রেস আর লীগের দুই পতাকাই ছিল। ডানে-বায়ে পতাকা নাড়াতে নাড়াতে ও সামনে এগিয়ে চলল। ঝাঁক ঝাঁক গুলির বর্ষণ হচ্ছিল—আর ও রক্তের বর্ষণের মধ্যে এগিয়ে চলেছিল। যখন গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে ও মাটিতে পড়ে গেল, তখন ও বলল, 'আমার এই কামিজ আর শালোয়ার যার দরকার তাকে দিয়ে দিও আর শিখ ধর্মানুসারে আমাকে পুড়িয়ে দিও।' শুধু এইটুকু বলেই ও ওর জীবন দিয়ে দিল ঐ ট্রাম লাইনের ওপর।

পতাকা দুটি ওর রক্তে রক্তিম হয়ে গেল। লীগের সবুজ পতাকা, কংগ্রেসের সবুজ সাদা এবং লাল পতাকা—দুই-ওর রক্তে এমন লাল হয়ে গিয়েছিল যে কারো পক্ষে বলা অসম্ভব ছিল এ কার পতাকা। সে না ছিল হিন্দু, না মুসলমান। সে তার নিজের রক্তে দু'টি পতাকার রঙকেই এক করে দিল। ও ছিল এক কৃষক। গ্রাম থেকে এসেছিল। গেঁয়ো এবং অশিক্ষিত গুণ্ডা।

আমি ওর সালোয়ার এবং কামিজ আমার হাসপাতালের হরিজন ধোপাকে দিয়ে দিলাম। ধোপা ঐ সালোয়ার পরেছিল। আর নীল কামিজ ওর স্ত্রী পরতে চাইছিল। ধোপার স্ত্রী আবার তা সেলাই করল, অন্য কাপড় দিয়ে জোড়া-তালি দিল। ধোপার বাড়ির বাইরে ঐ কামিজ জানলার শিকে ঝুলছিল···এই অদ্ভুত কামিজ পাঞ্জাব থেকে এসেছিল—যে কামিজ কোন কিষাণ শিশুর মা তার কাঁপা-কাঁপা হাতে

সেলাই করেছিল। লোকে বড় বড় লেখকদের, বড় বড় নেতাদের নমস্কার করে, আমি তোমাকে নমস্কার করছি। হে অ-নামী শত ছিন্ন কামিজ—বিস্মৃত ভুলে-যাওয়া গালিগালাজ খাওয়া কামিজ, আমি তোমাকে শত-সহস্রবার নমস্কার জানাই। তুমি এক সরল জাঠের মজবুত বুকের ওপর গুলি খেয়েছ। তুমি ওকে ভালোবসতে। ওর সাথে সাথে ছিলে। বেঁচে থাকার সময়, মৃত্যুর সময়, আর সেই সময় তুমি তার সঙ্গে ছিলে যখন দেশের বড় বড় নেতারা তাকে ছেড়ে পালিয়ে ছিল। তোমাকে শত-সহস্রবার নমস্কার। হে আমার দেশের বিস্মৃত গরীবীর মতো ছেঁড়া-ফাটা পুরানো কামিজ, তুমি নিজের কোলে এক সহজ সরল কৃষকের হৃদয়ের শব্দ লুকিয়ে রেখেছিলে আর এখন তুমি এক হরিজন মায়ের লজ্জা এবং তার ছোট্ট শিশুর প্রাণ রক্ষা করবে। এদের তোমার জীবনের সরলতা দাও। এদেরও নিজের মাটির প্রতি প্রেম দাও। নিজের আত্মার সেই সাচ্চা ভাবনা দাও—যে ভাবনা পেলে আমরাও ব্যারিকেডে এসে একত্রিত হতে পারি। ঐ ভাবেই হাওয়াতে পত পত করে ওড়ো। তুমি সৌন্দর্যের সত্যের এবং উপকারের প্রতিমূর্তি। তুমি অনাগত সেই ঝঞ্ঝারই সংকেত। এখন শৃঙ্খল ভাঙছে আর মানুষ ভালবাসতে শুরু করেছে।

এইভাবে তিনটি গুণ্ডা মারা গেল—এসব কিছুই দাঙ্গার দিনগুলিতে ঘটেছিল, কিন্তু সেই দাঙ্গা আর নেই। এখন চারদিকে শান্তি আর শান্তি। গুণ্ডারা মারা গিয়েছে, কিম্বা গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়েছে। এখন শহরে আর কোন গণ্ডোগোল নেই। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো আহত এবং লাশে ভরা। এখন শুধু শান্তি আর শান্তি। এখন অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিস্তব্ধ। আমি হাসপাতাল থেকে কর্ম-ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছি, স্নান করে খাবার খেয়ে বিছানার পাশে ল্যাম্প জ্বালিয়ে কোচে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। খবরের কাগজে লেখা ছিল: মিস্টার এবং মিসেস ফক্সি, মিষ্টার বন্দরিগর, মিস্টার স্তাওন এবং অন্যান্য সম্মানিত নাগরিকদের এক ব্রিটিশ জাহাজে নিমন্ত্রিত করা হয়েছে, পাড়ে জাহাজ নোঙর করা হয়েছে যাতে তাঁরা জাহাজী ধর্মঘটীদের বিদ্রোহকে থামাতে পারেন। মিষ্টার বন্দরিগরকে বিয়ের বর বলে মনে হচ্ছে। মিস্টার ফক্সি এক হাল্কা নীল রঙের সার্ট পরেছেন এবং মিসেস ফক্সির শাড়ির রঙ আগুনের মতো লাল। শান্তি কানুন সম্বন্ধে এবং আইন পরিবর্তনের মদিরা পান করা হচ্ছে।"...

আমি খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেললাম এবং তাক থেকে একটি বই টেনে পড়তে লাগলাম। মানুষের ইতিহাস—লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌। আমার চোখের সামনে ব্যারিকেড নাচতে লাগল। হাজার হাজার বৎসর আগেও মানুষ ব্যারিকেড তৈরী করেছিল—অত্যাচার মুর্খতা এবং সন্ত্রাসকে জয় করার জন্যে। আমার চোখের সামনে ব্যারিকেড নেচে চলেছে। বুদ্ধ, মহম্মদ যিশু···আলোর নিশানা পালটে গেল; প্রথম চার্লসের মাথা নজরে এল—ফাঁসীতে ঝুলছে। প্যারিসে গিলোটিন কমিউন··· অক্টোবর হত্যাকাণ্ড···আজও ব্যারিকেড তৈরী হচ্ছে?

মরোক্কয়···আলজেরিয়ায়···মিশরে···ভারতে···ইন্দোচায়নায়···ইন্দোনেশিয়ায় ঝঞ্ঝা আর ঝঞ্ঝা, এ ঝঞ্ঝা কে বুঝবে? এ হচ্ছে বিপ্লব, —এ বিপ্লব কে শুরু করবে? এ হচ্ছে কামিজ, মানুষের কামিজ হওয়ায় উড়ছে··· একে গুলিতে গুলিতে শতছিদ্র করে দাও। একে টুকরো টুকরো করে দাও। একে বোমা আর ট্যাঙ্ক দিয়ে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এই কামিজ আবার তৈরী হবে। এই কামিজের মৃত্যু নেই। এ মানুষের আত্মা।

এক বেশ্যার চিঠি

আমার বিশ্বাস এর আগে আপনি কোন বেশ্যার কাছ থেকে চিঠি পাননি। আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি আমার বা আমার পেশায় যারা রয়েছেন, সেইসব মেয়েমানুষের মুখও পর্যন্ত কোনদিন দেখেননি। আমি জানি আপনার কাছে এই চিঠি লেখা কত গর্হিত—বিশেষ করে এমন এক খোলা চিঠি। কিন্তু কি করব, অবস্থা এমনই যে এ দুটি মেয়ের জন্য আমি যে তীব্র তাগাদা অনুভব করছি, আর তাই আপনাকে এ চিঠি না লিখে উপায় নেই।

এ চিঠি আমি লিখছি না। বেলা আর বুতুল আমাকে দিয়ে এই চিঠি লেখাচ্ছে। সেজন্যে আমাকে মাপ করবেন। আমি এক বেশ্যা মেয়েমানুষ আপনাকে অকপটে এই চিঠি লিখছি—সেজন্যে সাচ্চা হৃদয়ে আমি আপনার কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আমার চিঠির যদি কোন বক্তব্য আপনার পছন্দ না হয় তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ বাধ্য হয়ে আমি এইসব লিখছি।

বেলা আর বুতুল আমাকে দিয়ে কেন এই চিঠি লেখাচ্ছে—আর ওদের এত কঠোর তাগাদাই বা কেন, তা বলার আগে আমার নিজের সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে চাই। ঘাবড়াবেন না, আমি আপনাকে আমার ক্লেদাক্ত জীবনের ইতিহাস বলতে চাইছি না। বলতে চাইছি না কবে কেমন করে আমি পতিতা হই। ভালো মানুষীর দোহাই দিয়ে আমি আপনার কাছে কোন মিথ্যা করুণার প্রত্যাশী হয়ে এই আর্জি পেশ করতে আসিনি। আমি আপনার দরদী হৃদয়ের কথা জেনে নিজের সাফাই গাইতে কোন মিথ্যা কাহিনীর অবতারনাও করছি না। এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এই নয়, আমি আপনার কাছে পতিতা জীবনের রহস্য এবং গোপনীয়তা খুলে ধরব। আমি নিজের সাফাই গেয়ে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু আমার জীবনের সেইটুকুই বলতে চাই যা ভবিষ্যতে বেলা আর বুতুলের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

আপনারা কয়েকবার বোম্বাই এসেছেন। জিমা সাহেব তো বোম্বাই বহুবার দেখেছেন। কিন্তু আপনারা আমাদের বাজার কেন দেখবেন? যে বাজারে

আমি থাকি তার নাম ফারস রোড। গ্রাণ্ট রোড আর মদনপুরার ঠিক মাঝখানে ফারস রোড। গ্রাণ্ট রোডের অন্য দিকে লেমিংটন রোড, অপেরা হাউস এবং চৌপাটী; মেরিন ড্রাইভ এবং পোর্ট এলাকায় ভদ্র লোকেরা থাকেন। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে ফারস রোড,—এই ফারস রোডে গরীব ও বড়লোক সবাই একসঙ্গে ফয়দা ওঠাতে পারে—যদিও ফারস রোড মদনপুরার খুবই কাছে, কারণ দারিদ্র্য এবং পতিতার অবস্থানের মধ্যে ফারাক প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই বাজার খুব সুন্দর নয়। এর মধ্যে আবার ট্রামের ঘড় ঘড় আওয়াজ দিনরাত্রি লেগে আছে। দুনিয়ার যত আওয়ারা কুত্তা, ছোকরা, রসিক নাগর, বেকার আর পুরানো দাগী এই গলির শোভা বর্ধন করে আছে। খোড়া, নুলো, তামাশাবাজ—যাদের কোন ঠিকঠিকানা নেই, সিফিলিস এবং গণোরিয়ার রোগী, কানা কোকেনওয়ালা, পকেটমার, সবাই এই বাজারে বুক টান করে চলাফেরা করে। নোংরা হোটেল, স্যাঁতসেঁতে ফুটপাথ, আবর্জনার স্তুপের ওপর লাখ লাখ মাছির ভনভনানি, কয়লা আর জ্বালানি কাঠের বিদিগিশ্রি গুদাম, পেশওয়ারী দালাল, শুকনো ফুলের মালা, সিনেমার অশ্লীল ছবির বই বিক্রেতা, কোক শাস্ত্র এবং নাংটা ছবির দোকানদার, চীনা এবং মুসলিম নাপিত, লাংগোট-পরা খিস্তিবাজ পালোয়ান—আমাদের সমাজের সমস্ত আবর্জনাই এই ফারস রোডে পাওয়া যাবে। সবাই জানে আপনি এখানে কেন আসবেন! কোন ভদ্রলোক এখানে ক্ষণিকের জন্যেও দাঁড়াতে পারেন না। যত ভদ্রলোক আছেন তাঁরা সব গ্রাণ্ট রোডের ঐ পারে থাকেন—আর যারা আরও ভদ্রলোক তাঁরা মালাবার হিলে থাকেন।

আমি একবার জিন্না সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ঐখানে ঝুঁকে সেলাম করেছিলাম। আপনার ওপর (জিন্না সাহেব) বুতুলের যে শ্রদ্ধা আছে তা আমি যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারব না। খোদা আর রসুলের পরে দুনিয়াতে যদি ও আর কাউকে চায় তবে তিনি হচ্ছেন আপনি। ও আপনার ছবি লকেটে বাঁধিয়ে নিজের বুকের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়···বুতুলের বয়স এখন মাত্র এগারো বৎসর, খুবই ছোট্ট মেয়ে, যদিও ফারস রোডের বাসিন্দারা ওর সম্পর্কে এখন থেকেই কু-ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু কি করা যাবে, অন্য কোন এক সময়ে তা আপনাকে বলব।

এই হচ্ছে ফারস রোড যেখানে আমি থাকি। ফারস রোডের পশ্চিম কোণে চীনা নাপিতের যে দোকান তারই ঠিক একপাশে এক অন্ধকার গলির মোড়ে আমার দোকান। লোকে অবশ্য একে দোকান বলে না, কিন্তু আপনি

সমঝদার মানুষ। আপনার কাছে কী লুকোব। আর কীই বা বলব, এখানেই আমার দোকান। এখানেই আমি ব্যবসা করি, বানিয়া, সব্জীওয়ালা, ফল-ওয়ালা, আটাওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা বা অন্যান্য দোকানদার যেমন ব্যবসা করে এবং খরিদ্দারকে খুশী করবার নিজের ফয়দার কথা ভাবে, আমার ব্যবসাও ঠিক সেই রকম, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আমি তাদের মতো ব্লাকমার্কেট করি না। আমার আর অন্য ব্যবসায়ীর মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

দোকানদারের পক্ষে এ জায়গা ভালো নয়---রাত্রি তো দূরের কথা, দিনেও লোকে এখানে হোঁচট খায়। এই অন্ধকার গলিতে মানুষ নিজের পকেট উজাড় করে দিয়ে যায়। মদ খেয়ে বমি করে, দুনিয়ায় যত গালিগালাজ আছে তা বলে চলে। কথায়-কথায় এখানে চাকু চলে, আর দু'তিন দিন পরে পরেই খুন হয়। আমিও তেমন কোন উচ্চ খানদান পতিতা নই যে পওন পুলে কিংবা ওরলিতে সমুদ্রের ধারে কোন ঘর নেই। আমি এক সাধারণ পতিতা, যদিও সারা হিন্দুস্তান আমি দেখেছি, বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়েছি, নানান লোকের মজলিসে বসেছি, তবুও এই বৎসর থেকে এই বোম্বাই শহরে—ফারস রোডের এই দোকানে আমি বসে আছি। আর এখন এই দোকানের সেলামী আমি ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারি—যদিও এই জায়গা তেমন ভালো নয় বরং খারাপই। চারদিকে পোকা গিজ গিজ করছে, আবর্জনার স্তূপ জমে আছে, ঘেয়ো কুত্তা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খরিদ্দারকে কামড়াতে যায়—তবুও এই জায়গার জন্যে আমি ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত সেলামী পেতে পারি।

এখানেই এক দোতলা বাড়িতে আমার দোকান। এতে দুটো ঘর আছে। সামনেরটা আমার বৈঠকখানা। এখানে আমি গান গাই, নাচি, খরিদ্দারকে খুশি করি। পেছনের ঘরে রুটি তৈরি করি, স্নান করি, এবং শোয়ার কাজও সারি। এখানে এক দিকে একটা নল আছে। এই পালঙ্কের নীচে আমার কাপড়ের সিন্দুক আছে। বাইরের ঘরে বিজলী আলো আছে, কিন্তু ভিতরের ঘরে কোন আলো নেই—একেবারে অন্ধকার। বাড়ির মালিক অনেক বছর ধরে কোন চুনকাম করেনি, করবেও না। আমার মতো এত অঢেল সময় আর কার আছে। আমি সারা রাত ধরে নাচি, আর দিনে এখানেই পাশ বালিশে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোই।

বেলা আর বুতুলকে পেছনের এই ঘর দিয়েছি। খরিদ্দাররা হামেশাই হাত মুখ ধোয়ার জন্য ঘরে আসে। বেলা আর বুতুল ভয় ভয় চোখে

ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ওদের চোখের সে ভাষাই আমার এই চিঠি বলছে। ওরা যদি আমার কাছে না থাকত তবে এই পাপী পতিতা আপনার খিদমতে এই বেয়াদপি পেশ করত না। জানি দুনিয়া আমাকে থু-থু দেবে, হয়তো আপনার কাছে আমার এ চিঠি পৌঁছবে না, কিন্তু তবু আমি নিরুপায়। এই চিঠি লিখেই যাব—এটাই হচ্ছে বেলা আর বুতুলের ইচ্ছা।

আপনি হয়তো ভাবছেন বেলা আর বুতুল আমার মেয়ে। না, তা ঠিক নয়। আমার কোন মেয়ে নেই। এই দুটো মেয়েকেই আমি বাজার থেকে কিনেছি। হিন্দু মুসলমানের যখন তুমুল দাঙ্গা—গ্রাণ্ট রোড, ফারস রোড এবং মদন পুরাতে মানুষের রক্ত জলের স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেই সময় এক দালালের কাছ থেকে আমি বেলাকে তিনশ' টাকায় কিনি। এই মুসলমান দালাল বেলাকে দিল্লী থেকে এনেছিল। বেলার বাবা-মা ঐখানে থাকত।

বেলার বাবা-মা রাওলপিণ্ডির রাজা বাজারের পেছনে পুঞ্চ হাউসের সামনে যে গলি সেই গলিতে থাকত। মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল। ভদ্র এবং এবং খুব সাদা-সিধে। বেলা তার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। রাওলপিণ্ডিতে যখন মুসলমানরা তলোয়ার নিয়ে হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু করল, তখন ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী।

বারোই জুলাইয়ের ঘটনা। বেলা ইস্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল। তাদের এবং অন্যান্য হিন্দু বাড়ির সামনে অনেক লোকের জটলা দেখল। তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং বাড়ির পর বাড়ি আগুন লাগাচ্ছিল—সেই সব বাড়ির লোকদের শিশুদের মেয়েদের ঘর থেকে টেনে বের করে হত্যা করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিচ্ছিল।

বেলা নিজের চোখে তার বাবাকে কাটতে দেখল—মাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখল। জানোয়ার মুসলমানরা ওর মার স্তন কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিল—যে স্তন দিয়ে মা, সব মা—সে হিন্দু আর মুসলমান মা, খ্রীষ্টান মা, ইহুদী মা—যে মাই হোক না কেন তার সন্তানকে দুধ দেয় আর মানুষের জীবনে এবং সমস্ত বিশ্বে সৃষ্টির এক নতুন পরিচ্ছদ খুলে দেয়। ঐ দুধ ভরা স্তন আল্লাহ আকবর ধ্বনির সঙ্গে কাটা হয়। কে সৃষ্টির সঙ্গে অত্যাচার করেছে, কোন্ জালিম অন্ধকার এই রূপের মধ্যে কালিমা ঢেলে দিয়েছে। আমি কোরান পড়েছি, আমি জানি রাওলপিণ্ডিতে বেলার বাবা-মাকে যা করা হয়েছে তা ইসলাম নয়, তা

মানবতা নয়, তা শত্রুতাও নয়, তা বদলাও নয়—এ এমন এক বর্বরতা এমন এক নিষ্ঠুরতা, এমন এক শয়তানী যা অন্ধকারের বুকেই জন্ম নেয় এবং সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিটুকুকেও কলঙ্কময় করে তোলে।

বেলা এখন আমার কাছে আছে। আমার আগে ও এক দাড়ি-ওয়ালা দালালের কাছে ছিল, তারও আগে দিল্লীর এক মুসলমান দালালের কাছে ছিল। ও যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী তখন ওর বয়স বারো বৎসরের বেশী ছিল না। বাড়িতে যদি থাকত তবে ও আজ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। আর যখন বড় হত তখন ওর বাবা-মা কোন ভদ্র ঘরের গরীব ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিত। ও ওর ছোট্ট সংসার পাততো—নিজের স্বামী, ছোট শিশু সন্তান আর ঘরোয়া জীবনের ছোট-ছোট খুশী দিয়ে। কিন্তু এই কোমল কুঁড়ি অকালেই ঝরে পড়ল। বেলাকে এখন বারো বৎসরের মেয়ে বলে মনে হয় না। ওর বয়স একটু বেড়েছে, কিন্তু জীবন ওর খুবই বিষাদময়। ওর চোখে ভয়, মানব জীবনের যে তিক্ততা, নৈরাশ্যের যে রক্ত, মৃত্যুর যে পিপাসা—কায়েদে আজম সাহেব, আপনি যদি তা দেখে থাকেন তবে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবেন? আপনি তো ভদ্রলোক। ভদ্রঘরের হিন্দু-মুসলমানের সরল মেয়েদের নিশ্চয়ই দেখেছেন। আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন সরলতার কোন ধর্ম নেই। তা সমস্ত মানুষেরই সম্পদ—সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য। যারা তাকে ধ্বংস করে দুনিয়ার কোন ধর্মের খোদাই তাদের ক্ষমা করতে পারে না।

বুতুল আর বেলা দু'জনে আপন বোনের মতো আমার এখানে থাকে। বুতুল আর বেলা আপন বোন নয়। বুতুল মুসলমান মেয়ে, বেলা হিন্দু পরিবারের। আজ তারা দুজনে ফারস রোডে এক পতিতার বাড়িতে বসে আছে। বেলা রাওলপিণ্ডি থেকে এসেছে, আর বুতুল জলন্ধরের এক গ্রাম—খেমকরণ, সেখানকার এক পাঠানের মেয়ে। বুতুলরা সাত বোন। তিন জনের বিয়ে হয়েছিল, বাকী চারজন ছিল কুমারী। বুতুলের বাবা খেমকরনের এক সাধারন কৃষক। গরীব কিন্তু গর্বোদ্ধত পাঠান—যারা আজ থেকে বহু বহু বছর আগে খেমকরনে এসে ঘর বেঁধেছিল।

জাঠদের এই গ্রামে মাত্র তিন-চার ঘর পাঠান ছিল। এরা যেভাবে মাথা নীচু করে থাকত, পণ্ডিতজী, শুধু এইটুকু বললেই আপনি বুঝতে পারবেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে মসজিদ বানানোর এদের কোন অধিকার ছিল না। এরা নিজের ঘরে লুকিয়ে নমাজ পড়ত। যুগ

যুগ ধরে রণজিৎ সিংহের শাসনের কাল থেকেই কোন মোমিন এই গ্রামে নমাজের আজান দেয়নি। হৃদয় এদের ধর্মের ভক্তিতে ভাস্বরিত ছিল, কিন্তু কোন কথা বলার অধিকার ছিল না।

বুতুল তার বাবার সবচেয়ে আদরের মেয়ে ছিল। সাতজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে সুন্দর বুতুল এত সুন্দর ছিল যেন সামান্য হাতের স্পর্শে মলিন হয়ে যাবে। পণ্ডিতজী, আপনি নিজে কাশ্মীরের মানুষ, কলাকার না হয়েও আপনি জানেন সৌন্দর্য কাকে বলে। এই সৌন্দর্যই আমার দুর্গন্ধময় জঞ্জালে এমনভাবে পড়ে আছে যে একে পরখ করার মতো কোন শরীফ আদমী পাওয়াই হচ্ছে মুশকিল। এই আবর্জনায় বদমাশ মারোয়াড়ি, ঘন মুছওয়ালা ঠিকেদার, অপবিত্র চাহনির কালোবাজারীদের দেখা যায়। বুতুল একেবারে নিরক্ষর। ও শুধু জিন্না সাহেবের নাম শুনেছে। পাকিস্তান এক আচ্ছা তামাশা মনে করে ও শ্লোগান দিয়েছিল—তিন-চার বৎসরের শিশুরা যেমন ঘরের মধ্যে শ্লোগান দিতে থাকে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। এগারো বৎসরই তো ওর বয়স। নিরক্ষর বুতুল—মাত্র কয়েকদিন আগে ও আমার কাছে এসেছে। এক হিন্দু দালাল ওকে আমার কাছে নিয়ে আসে! পাঁচশ' টাকা দিয়ে আমি ওকে কিনে নিই। এই হিন্দু দালাল ওকে লুধিয়ানা থেকে এনেছিল—এক জাট দালালের কাছ থেকে। এর আগে ও কোথায় ছিল জানি না। হাঁ, এক লেডি ডাক্তার আমাকে অনেক কিছু বলেছেন। আপনি যদি তা শোনেন তবে পাগল হয়ে যাবেন। বুতুল আধা পাগল। ওর বাবাকে জাটরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে যে হিন্দু সভ্যতার অতীতের ছ'হাজার বৎসরের চামড়া টেনে খুলে দিয়েছে—মানুষের বর্বরতা জানোয়ারের উলঙ্গ রূপ নিয়ে সবার সামনে এসেছে। প্রথমে জাটরা তার চোখ তুলে নেয়, তারপর মুখে প্রস্রাব করে দেয়, এবং পরে গলা থেকে চিরে পেট পর্যন্ত নামিয়ে নাড়ি ভুঁড়ি বের করে। ওর বিবাহিতা মেয়েদের জবরদস্তি মুখ কালি করে ঐখানে ওদের বাবার লাশের সামনেই। রেহানা, গুল দুরখ্সা, মরজানা, সোসন, বেগমকে—এক এক করে জানোয়াররা তাদের মন্দিরের মূর্তিকে অপবিত্র করে। যারা ওদের জীবন দান করেছে, যারা ওদের গুন গুন করে গানের কলি শুনিয়েছে, যারা ওদের সামনে লজ্জায়, ভালোবাসায়, পবিত্রতায় মাথা নীচু করেছিল—সেই সমস্ত বোনের, স্ত্রীর, মায়ের সঙ্গে অসভ্য আচরন করেছে। হিন্দুধর্ম তার নিজের ইজ্জত

খুইয়েছে, নিজের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে, নিজের সংস্কৃতিকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আজ ঋক্ বেদের প্রতিটি মন্ত্র স্তব্ধ, আজ গ্রন্থসাহেবের প্রতিটি দোহা লজ্জায় অবনত, আজ গীতার প্রতিটি শ্লোক ক্ষত-বিক্ষত। এমন কে আছে যে আমার সামনে অজন্তার চিত্রকলার নাম উচ্চারণ করতে পারে, অশোকের অভিলেখ শোনাতে পারে, এলোরার মন্দিরের গুনকীর্তন করতে পারে। দাঁতে পিষ্ট বুতুলের পাঁপড়ির মতো নরম ঠোঁট, বাহুতে জানোয়ারদের দাঁতের নিশানা আর ওর সরু সরু দুই উরুর মাঝে তোমাদেরই অজন্তার মৃত্যুছায়া, তোমাদের এলোরার জানাজা, তোমাদের সভ্যতার কফন। এসো এসো, তোমাদের সৌন্দর্য দেখাই,—যে সৌন্দর্য এতদিন বুতুল ছিল, এসো কফনে ঢাকা লাশ দেখাই,—যে আজ বুতুল। আবেগে আমি অনেক কিছু বলে ফেললাম। যা বললাম, তা আমার বলা ঠিক হয় নি। হয়তো এতে আপনাকে অসম্মান করা হবে। হয়তো এর থেকে বেশী কটু কথা আপনাকে আর কেউ বলেনি—কেউ শোনায়নি। হয়তো আপনি এসব কথা অনুভব করছেন। কিন্তু আমি যা দেখেছি আপনি তার জন্য কিছুই করতে পারবেন না। আপনারা পণ্ডিতজী·জিন্নাসাহেব বেশী কিছু করতে পারবেন না—সামান্য কিছুও করতে পারবেন না। তবু আমাদের দেশে —হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে স্বাধীনতা এসেছে। আর একজন পতিতার আপনাদের জিজ্ঞেস করার অন্তত এই অধিকারটুকু আছে, বেলা আর বুতুলের কি হবে ?

বেলা আর বুতুল দুটি মেয়ে, দুটি চাঁদ, দুটি সভ্যতা, দুটি মন্দির আর মসজিদ। বেলা আর বুতুল এখন ফারস রোডে এক পতিতার আশ্রয়ে আছে—যে পতিতা চীনা নাপিতের দোকানের পাশে নিজের ব্যবসার ধান্দা করে। বেলা আর বুতুলের এই ধান্দা পছন্দ নয়। আমি ওদের কিনেছি। আমি যদি চাই ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারি। না, আমি সে কাজ করব না—যা রাওলপিণ্ডি আর জলন্ধর ওদের সঙ্গে করেছে। আমি এখন পর্যন্ত ফারস রোডের জগত থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু আমার খরিদ্দাররা যখন পেছনের কামরায় গিয়ে তাদের হাত-মুখ ধুতে থাকে, তখন বেলা আর বুতুলের চোখ যেন আমাকে কিছু বলতে চায়।

আমি এই চোখের ভাষা বোঝাতে পারব না। আমি ঠিক মতো ওদের কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিতেও পারব না। আপনি স্বয়ং

কেন এই চোখের ভাষা পড়ছেন না? পণ্ডিতজী, আমি চাই আপনি বেলাকে আপনার মেয়ে করে নিন। জিন্না সাহেব, আমি চাই বুতুলকে আপনার দুলারী করে নিন। আপনি দয়া করে একবার ফারস রোডের এই ষড়যন্ত্র থেকে ওদের উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে যান। আর লক্ষ কণ্ঠের ঐ আওয়াজ শুনুন—যে আওয়াজ নোয়াখালী থেকে রাওলপিণ্ডি, ভরতপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গভর্নর হাউসে কি এদের এই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?—এই আওয়াজ কি আপনি শুনতে চান?

আপনার
ফারসরোডের এক পতিতা

ব্রহ্মপুত্র

তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথি।
আমার তরে রাতি আমার তরে তারা ॥
তোমার আছে ডাঙ্গা আমার আছে জল।
তোমার বসে থাকা আমার চলাচল।

[রবীন্দ্র সঙ্গীত]

খোঁপায় সাদা গোলাপ লাগিয়ে এক গাঢ় বাসন্তী রঙের লাল আঁচলের শাড়ি পরে লতিকা সেন খোকনের দিকে হেসে এগিয়ে আসছিল। খোকন কাঠের ঘোড়ার ওপর বসে ছিল, আর ঘোড়াকে চাবুক কশতে কশতে মনে মনে জোর ছুটে চলেছিল। মাকে যখন তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল তখন কাঠের ঘোড়ার লাগাম সে খুব জোরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া উল্টে গেল। খোকন নীচে আর ঘোড়া তার ওপরে গিয়ে পড়ল।

খোকন কাঁদতে লাগল। লতিকা হাসতে হাসতে খোকনকে কোলে তুলে নিল।

খোকন কাঁদতে কাঁদতে বলল, ঘোড়াটা ভীষণ পাজি। আমাকে নীচে ফেলে দিয়েছে।

লতিকা বলল, তুমি এতো জোরে বেচারীর লাগাম ধরে টেনেছ কেন?

খোকন বলল, আমি যে মাকে দেখছিলাম।

লতিকা ওকে চুমু খেয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা, দেখ আমি বাজারে যাচ্ছি, সোনমণির জন্যে কি নিয়ে আসব?

খোকন বলল, আমি বাঁশী নেব। ঘোড়ায় চড়ে বাঁশী বাজাব আর আমার ফৌজের আগে আগে যাব।

বলতে বলতে খোকনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ওর মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। ও কাঁদতে ভুলে গেল। চোখের জল এখনও ওর গালের ওপর ঝিকমিক করছিল। লতিকা রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছে দিল। দিয়ে ওর চুলের গুচ্ছে আঙুল চালিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিল।

—'লতিকা তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

কাকিমা লতিকাকে জিজ্ঞেস করলেন। হাত মুছতে মুছতে কাকিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাকিমার অনেক বয়স হয়েছে। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। মুখে ভাঁজ পড়েছে। দেখতে শুকনো শুকনো এবং রোগা। তাঁর চেহারা যেন অনেক দুঃখের কথা জানান দিচ্ছিল। কিন্তু এ বয়সেও কাকিমার চেহারায় এক অদ্ভুত ধরণের সরলতা ছিল। অথচ যে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সব কিছু হারিয়ে বসে থাকে সেই বয়সেও তা কাকিমার মধ্যে অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের চেহারায় এই সারল্য দেখা যায় না। কাকিমা কিভাবে এবং কি যত্নে এই সারল্যকে রক্ষা করেছেন সেই গোপনীয়তা ফাঁস করেন না। কাকিমার বয়স হয়েছে আটষট্টি। এই বয়সে কাকিমা ব্রহ্মপুত্রের ধারে তাঁর যে গ্রাম, সেই গ্রামকে দু দুবার ভেসে যেতে দেখেছেন। আবার দু' দুবার বসতি গড়ে উঠতে দেখেছেন। সাত সাতবার ছোটখাট আকাল আর তিনবার বড় আকাল দেখেছেন। আর শেষবারের আকালে কাকিমার গোটা পরিবারটাই উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে কাকিমাকে নিজের গ্রাম ছেড়ে লতিকাদের এখানে—এই কলকাতায় চলে আসতে হয়। রায়বাহাদুর মজুমদার লেনে লতিকাদের বাড়ি। কাকিমা প্রথম যে বার কলকাতায় আসেন সেবার অনেক কষ্টে তাঁকে এ বাড়ি খুঁজে বের করতে হয়। বাড়ি খুঁজে যখন তিনি ভেতরে ঢুকছিলেন তখন বাড়ির সামনের মন্দিরে আরতি হচ্ছিল। কিন্তু লতিকার ঘরে সেই আরতির সময়েও অন্ধকার ছিল আর লতিকার স্বামী নড়বড়ে সিঁড়িতে নিঃশব্দে পা ফেলে বাইরে বের হচ্ছিল। কাকিমাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কাকিমা আমি আবার আসব। এখন দেরী করতে পারছি না। একটা জরুরী কাজ আছে। লতিকা তোমার দেখাশোনা করবে।' বলে সে দ্রুত চলে গেল। আর কাকিমা দেখলেন, লতিকার স্বামী ক্ষণিকের জন্যে লতিকার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবার ছেড়ে দিল। এবং অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের দরজার কাছে যে গলি আছে সেই গলি ধরে চলে গেল। কাকিমা দেখলেন, লতিকা খুব সাবধানে দরজা খুলল। আলোর একটা রেখা কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে এসে পড়ল এবং আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সময় কাকিমা লতিকাকে এক লহমা দেখলেন—লম্বা, শ্যামবর্ণ, আকর্ষণীয় এক মেয়ে। পরনে ছিল সাদা শাড়ি আর ওর চোখের কোণে জল ঝলমল করছিল। চোখের ঐ জল দেখে কাকিমা ক্ষণিকের জন্যে

কেঁপে উঠেছিলেন। মানুষ ধান এবং গম বোনে, আর কাকিমা নিজের জীবনে শুধু অশ্রুই বুনেছেন। উনি ভাবলেন, এ যখন কলকাতা তখন নিশ্চয়ই এ অশ্রু নয়। অশ্রু তো শুধু ব্রহ্মপুত্রের কিনারেই থাকে। যেখানে কৃষকরা মুক্তোর মতো ধান বোনে আর অশ্রু কাটে। এই সংসারই কি এমনি দুঃখে ভরা? যে সুখ-শান্তির জন্যে কাকিমা এই কলকাতায় এসে-ছিলেন তা তিনি মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেলেন। উনি আলতো ভাবে লতিকার হাত ধরে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বৌমা!' লতিকা হেসে নিজের অশ্রু পান করে নিল। কাকিমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে সে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কিছু না কাকিমা, ওপরে চলুন।'

লতিকা কাকিমার বোচকা তুলে তাঁকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনের পর, আজ পর্যন্ত আর কোন দিন তিনি লতিকার স্বামীকে দেখেননি। এখানে কোন ব্রহ্মপুত্র নেই বলে কাকিমা নিজের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন ব্রহ্মপুত্র এখানেও আছে। আর লতিকার স্বামী এই নদী পার না হয়ে কোন দিন ঘরে ফিরতে পারবে না। তিনি প্রায়ই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় মেলতে মেলতে ভাবেন আর তাঁর চোখের কাঁপা-কাঁপা মণি বিস্ময়ে নীচের গলিতে ছুটন্ত মানুষদের দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠে। কোন্ ঝঞ্ঝার ভয়ে ওরা পালাচ্ছে? জল কতদূর বেড়েছে? কোথায় আগুন লেগেছে?

কিন্তু কাকিমা এ সব প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো জানেন না। তাঁর কাঁপা-কাঁপা চোখের মণি নীচের গলিতে ছুটন্ত মানুষদের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল।

তিনি যখন এগিয়ে এসে লতিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস লতিকা', তখন তাঁর চোখে সেই একই অদ্ভুত ধরণের ভয় ভয় ভাব ছিল।

লতিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, মিটিং-এ যাচ্ছিস?' লতিকার হাসি খুব সুন্দর ছিল। কাকিমার হাসিও খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু কাকিমার হাসি ছিল এমন এক হাসি, যেন মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে চাইছে এবং হৃদয়ঙ্গম করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসতে চাইছে। কাকিমার হাসিতে ছিল সেই অন্তরীক্ষের আকর্ষণ আর লতিকার হাসিতে ছিল ভোরের সেই ঔজ্জ্বল্য—যে ঔজ্জ্বল্য বহু, বহু দূর থেকে বা খুব, খুব কাছ থেকে এসেছিল। যেন সেই হাসি ঝলমল নক্ষত্রের মতো ধীরে ধীরে অন্ধকারের পর্দা ধরে টানছিল। আর সেই অসাধারণ

মিষ্টি হাসি—এক টুকরো হাসি যেন রেশমের ওপরে রেশম রেখে দিল। এই হাসি নিয়ে এসেছিল যেমন এক অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা তেমনি নিয়ে এসেছিল এক দৃঢ়তার অনুভব। এই হাসিতে ব্রহ্মপুত্রও ছিল, তুফানও ছিল—আর ছিল এক নৌকো, যে নৌকো ওপারে নিয়ে যেতে পারে।

কাকিমার ঠোঁট কাঁপছিল। একগুচ্ছ সাদা চুল হওয়ায় উড়ে তাঁর গালের ওপর এসে পড়েছিল। তিনি এক অদ্ভুত বিনয়ের সঙ্গে লতিকাকে বললেন, তুমি মিটিংএ কি যাবেই যাবে?

লতিকা হাসল। হেসে সেই সাদা চুলের গুচ্ছটা খুব স্নেহের সঙ্গে তুলে কাকিমার কানের পেছনে দিয়ে দিল। তারপর আবদারের সঙ্গে বলল, কাকিমা. আটটার আগেই আমি ফিরে আসব। এলেই কিন্তু খাবার চাই। তখন কিন্তু সত্যিই খুব খিদে লাগবে।

কাকিমাকে এটুকু বলে লতিকা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে খুব তাড়াতাড়ি নীচে নামতে লাগল। কাকিমা খোকনের হাত ধরে অনেকক্ষণ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। লতিকা দরজা খুলল, আলোর একটা ক্ষীণ রেখা এসে পড়ল। তারপর আবার অন্ধকারে ভরে গেল। খোকন বলল, কাকি চলো। আমাকে বিশ্বকবির ছোট, চাঁদের গান শোনাও।

খোকনের কথায় কাকিমা সব কিছু ভুলে গেলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট চাঁদের গান তিনি নিজেও খুব ভালোবাসতেন। খোকনকে আজ তিনি সেই গান শোনালেন। যে গানের কলিতে আছে, খোকা হারিয়ে গিয়েছে আর তার মা খোকন নাম ধরে ডেকে ডেকে যখন খুঁজছে তখন খোকা জুঁই ফুল হয়ে মায়ের কোলে এসে লুকোচ্ছে।

গান গাইতে গাইতে কাকিমার মনে পড়ে যায় সুন্দর জুঁই ফুলের কথা। এক এক করে সমস্ত জুঁই ফুল ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল তরঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে। আর অবশেষে কাকিমার কোল খালি হয়ে গিয়েছে। সবকিছু হারিয়ে গিয়েছে—মুক্তোর মতো ছেলে আর মুক্তোর মতো ধান। শুধু থেকে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ আর জমিদারের প্রাসাদ। গান গাইতে গাইতে কাকিমা থেমে গেলেন, থেমে খোকাকে উঠিয়ে খুব জোরে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

খোকন ছটফট করে উঠল, উহুঁ, কাকি একটা গান গাও। কাকিমা আবার একটা গান গাইলেন, সেই গানে চাঁদের নৌকো আকাশের নদীতে হেলে দুলে ভাসছিল। আর খোকন তাতে বসে দুলে দুলে বাইছিল, আর বাইতে বাইতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রায় বাহাদুর মজুমদার লেন থেকে বেরিয়ে লতিকা ঘনশ্যাম দাস বাজারের দিকে এগুচ্ছিল। যেতে যেতে লতিকার একবার মনে হল কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে। ও ঘুরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। বোধহয় এ তার মনের ভুল, কেউ তার পিছু নেয়নি। কিন্তু তবুও সাবধান থাকা ভালো। লতিকার মনে পড়ল, শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে, সুতরাং দেখেশুনে যাওয়া ভালো। লতিকা আর একবার চারদিকে তাকাল। বাজারে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। দোকান-পাট সব সাজানো-গোছানো। লোকজন জিনিসপত্র কেনাকাটি করছে। বাস এবং ট্রামও চলছে। কিন্তু তা সত্বেও লতিকার মনে হল এই নিস্তব্ধতা এই শান্তির যেন কোন স্থায়িত্ব নেই—সব ওপর ওপর। যেন সমস্ত পরিবেশ ধারালো ব্লেডের মতো উঁচিয়ে আছে, একটু হাত লাগলেই রক্ত ঝরবে। মানুষজন চলাফেরা করছে—কাজ কর্মও করছে, বস্তা ওঠাচ্ছে আর এদিক-ওদিক হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু লতিকার মনে হচ্ছিল তার পেছনে ক্রোধের গর্জন হচ্ছে আর বহুদূর দিগন্তে লাল আলো তার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন ধুধু বালির প্রান্তে ধীরে ধীরে তরঙ্গমালা এগিয়ে চলেছে। লতিকা চমকে উঠে তার সামনে এবং পিছনে দেখতে লাগল।

খেলনার এক দোকানে গিয়ে ও খোকনের জন্যে একটা বাঁশী কিনল। কিনে ঠোঁটে চেপে ধরে বাজাল। দোকনদার হেসে বলল, আপনি তো খুব সুন্দর বাজাতে পারেন। লতিকা হেসে বাঁশী তার ব্যাগের ভেতর রেখে দোকানদারকে দাম দিতে লাগল। ঠিক সেই সময় সে আবার অনুভব করল কেউ তার পেছন দিয়ে চলে গেল। ও ঘুরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। একটু দূরে গান্ধী টুপি-পরা দু'জন লোক বেশ মশগুল হয়ে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। লতিকা আরও সাবধান হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মিটিং-এ যাওয়ার আগে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাবে। তার স্বামী এই শহরেই আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু ও ঠিক করে ফেলল আজ ও আর তার সঙ্গে দেখা করবে না। খুব সম্ভব পুলিশ পেছন নিয়েছে, আর ও নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে পুলিশের কাছে তার ডেরার ঠিকানা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে না। লতিকার বুক খুব জোরে ধরাস ধরাস করতে লাগল। দোকান থেকে উঠে যে দিকে ওর স্বামী লুকিয়ে আছে সেই দিকে ও চোরা চোখে তাকাল। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রে বাজারের বাস ধরল। আর বেশী কিছু ও চিন্তা করতে পারল না। হেঁটেই

যাবে বলে ও ঠিক করেছিল, কিন্তু ভাবল হাঁটতে হাটতে আবার ওর মন পরিবর্তন না হয়ে যায়। তাই ও বাসে চড়াই ঠিক করল।

বাসে নীলিমা এবং প্রতিভার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল। নীলিমা খুব নরম স্বভাবের মেয়ে ছিল। খুব বড়লোক বা দেখতেও খুব সুন্দর সে ছিল না আর লেখা-পড়াও সে খুব বেশী জানত না। কিন্তু তাকে দেখে মনে হত সে খুব সুন্দরী, খুব বড়লোক আর খুব লেখা-পড়া জানা মেয়ে। আসলে তার স্বভাবে আভিজাত্যের এমন এক ঠমক ছিল যে সে তার ছোট্ট ঘরে কম আয়ে আর তার কম বিদ্যা-বুদ্ধিতে এমন এক জীবন যাপন করত দেখে মনে হত সে জীবন এপ্রিলের বর্ষার মতো নির্মল আর উজ্জ্বল। ভালো সেন্টের খুব শখ ছিল নীলিমার। কারণ হাসপাতালে সব সময় তাকে নোংরা আর গলিত দুর্গন্ধ নিয়ে কাজ করতে হত! নার্সের কাজ করতে করতে এই দুর্গন্ধের সঙ্গে তার একটা মন কষাকষিও হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রায়ই ছুটির পর সন্ধ্যার সময় সে তীক্ষ্ণ গন্ধের সেণ্ট মাখত। কিন্তু যেদিন তার কমিউনিস্ট স্বামী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে জেলে গেল, সেদিন থেকে সেন্টের তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা জাগল। এখন তাকে দেখলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভাবুক-ভাবুক মেয়ে বলে মনে হয়। এখনও তার ঘর দোয়ার আয়নার মতো স্বচ্ছ আর তকতকে। কিন্তু তার চুলে তেলের কোন সুঘ্রাণ ছিল না। তাই লতিকা আজ তার চুলে কোন সুগন্ধ না পেয়ে অবাক হল।

লতিকা তাকে জিজ্ঞেস করল, কি খবর, স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?

নীলিমা হেসে বলল, না পাগলী, আমি তোর সঙ্গে মিটিং-এ যাচ্ছি।

আর প্রতিভা তার টোপা-টোপা গালের ওপর চাটি মারতে মারতে বলল, আঃ! আজ যেন সুগন্ধের তুফান উঠেছে, চারদিকে শুধু চামেলি আর চামেলির গন্ধ মো মো করছে। লতিকা আজ কি সাজই না সেজেছে। বসন্ত আজ চরাচর ছেয়ে এসেছে, যেন চারদিকে লাল আবির উড়িয়ে দিয়েছে। সখিরা! তোমরা কী মিটিং-এ যাওয়ার জন্যে এমন সাজে সেজেছ? সেখানে কাকে এমন সৌন্দর্য দেখাবে?

বলতে বলতে প্রতিভা হো হো করে হেসে উঠল। প্রতিভার স্বভাবই এমন, নিজেই কথা বলে যেত, আবার নিজেই হেসে উঠত। প্রতিভা দেখতে ছিল বেশ নাদুস নাদুস আর গোল-গাল। তার একমাত্র ছেলে তার মার মতোই নাদুস-নাদুস গাট্টা-গোট্টা আর খুব খোশ মেজাজের ছিল। কিন্তু স্বামী ছিল চিড়বিড়ে মেজাজের আর গম্ভীর প্রকৃতির। প্রতিভা আর তার স্বামীর বৈশিষ্ট্য তাদের ছেলের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ ছেলে

মায় মতো হৃষ্টপুষ্ট আর বাবার মতো গম্ভীর প্রকৃতির। একটু এদিক ওদিক হলেই চীৎকার করে গলা ফাটাত। প্রতিভা আজ ছেলে আর স্বামী—দুজনকে ঘরে ছেড়ে এসেছে। হাসতে হাসতে বন্ধুদের বলেছিল, আজ বাড়িতে কীনা মজা হবে। ওরা দুজন আজ পালা করে কাঁদবে, আর দু'জন দু'জনের দিকে বাসনপত্র ছুঁড়ে নিজেদের মনকে হালকা করবে।

লতিকা বলল, এভাবে ঘরদোয়ার রাখলে কাজ কর্ম কেমন করে চলবে?

প্রতিভা বলল, তবে কি করব বন্ধু, আমার দ্বারা তো একসাথে দু দুটো কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আজ সকালে মিটিং-এর জন্যে যখন ভাষণ লিখছি তখন পতিমশায় চা চাইল, চা দিতে না দিতেই খাবার চাইল। খাওয়া হয়ে যেতেই টাই চাইল। খুঁজে পেতে টাই দিতে না দিতেই ছেলে কুকুরের মুখে হাত দিয়ে মল্লার রাগ শুরু করে দিল। আমি কুকুরকে পেটাতে না পেটাতেই পতিমশায় শ্যাম কল্যাণ গাইতে শুরু করল। এখন চলে এসেছি, দুজনে মিলে ভৈরব রাগিনী গাইছে। এখন বল, আমি কি করি?

নীলিমা বলল, বাচ্চাটাকে তো কোন ভালো ডাক্তার দেখাও।

প্রতিভা গলা চড়িয়ে বলল, কেমন করে দেখাব? কলকাতার ভালো ডাক্তাররা যা ফিস নেন তাতে আমার পুরো রেশন হয়ে যাবে। ডাঃ বি. সি. রায়কে দেখাব নাকি? তুমিও দেখছি কখনও কখনও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মানুষদের মতো কথাবার্তা বল। এত টাকা খরচ করলে ছেলে আর ওকে কি খাওয়াব?

বলে প্রতিভা হো হো করে হেসে উঠে আবার বলল, আজ এক ডাক্তার বলল ওকে মাছের সঙ্গে শালগম রেঁধে খাওয়ালে মোটা হয়ে যাবে। আজকে তাই বাজার থেকে শালগম কিনেছি—এই দেখ।

প্রতিভা আঁচলের বাধন খুলে শালগম দেখাল। নীলিমা এবং লতিকা মনে মনে হাসল। সত্যিই প্রতিভা খুব সরল মেয়ে ছিল। তার ওপর রাগ করা খুব কঠিন। নীলিমা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিভার কাঁধের ওপর তার নরম হাত রাখল এবং লতিকা খুব আদরের সঙ্গে প্রতিভার কোমর জড়িয়ে ধরল। লতিকা প্রতিভাকে খুব ভালোবাসত, কারণ প্রতিভা মহিলা সমিতিতে খুব ভালো কাজ করছিল। আর বক্তা হিসেবে কোন মেয়েই তার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও কত সরল আর সাদাসিধে প্রকৃতির মেয়ে ছিল। কি অবিশ্রান্ত কাজই না সে করতে পারত। বসিলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে

থাকতে পারে বা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এক নাগারে হাঁটতে পারে। গোয়ার্তুমী এবং অভিমান তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। বান্ধবীদের কোন কথায় সে জ্বলে ওঠে না। কত দুঃসাধ্য কাজই না ওকে দেওয়া হয়েছে, ও সেসব কাজ হাসি মুখে সেরেছে। প্রতিভার এই হাসি তার হৃদয়ের অন্তরতম স্থান থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, আর ফোয়ারার জলধারার মতো তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। আকাশে মেঘের আড়ালে চাঁদ যেমন ঝলমল করে হাসে তেমনি ছিল লতিকার হাসি। আর প্রতিভার হাসি যেন সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গের মতো সমস্ত তটভূমিতে আছড়িয়ে পড়ছিল।

লতিকা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আজ তুই মিটিং-এ কি বলবি ?

প্রতিভা বেশ আত্মবিশ্বাসে তার গোল-গোল চোখ ঘুরিয়ে বলল, বোনেরা দেখ, আজ তোমাদের পচা-গলা সমাজের আবর্জনায় এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব যাতে সারা কলকাতা জ্বলে ওঠে। ব্যাস, তুমি শুধু তোমার এই সুন্দর শাড়ি আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিও।

এই কথা বলে প্রতিভা জোরে হেসে উঠল এবং লতিকার পিঠে জোর এক চাটি মারল। প্রতিভার দুষ্টুমিতে কমনীয় লতিকা তার সরু কোমর গুটিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল আর ঠিক তখনই বাস বৌ-বাজারের মোড়ে এসে থামল। তিন বন্ধু বাস থেকে নেমে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন হলের দিকে পা বাড়াল। আর ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে আর একটি বাস এসে থামল। সেই বাস থেকে নামল একটি সুন্দরী মেয়ে। তার খোপা খুব পরিপাটি করে বাধা, পরনের রেশমী শাড়িতে জরির কাজ আর ঝলমল ব্লাউজ দেখে প্রাতভা চেঁচিয়ে উঠল আরে অমিয়া···অমিয়া···মেরি জান অমিয়া! আজ তুই কি করেছিস। দু দুটো বাচ্চার মা হয়ে তুই আজ নব বধূর মতো সেজেছিস।

অমিয়া ঘোষ হেসে এগিয়ে আসতে লাগল। গাড়ি আসতে দেখে সে থেমে গেল। গাড়ি চলে গেলে সে বেশ কায়দা করে শাড়িটা সামলিয়ে নিয়ে যেন মৃদু মন্দ বাতাসের ঢেউ ঢেউ-এ পাখনা মেলে, ঠমকে ঠমকে রাস্তা পার হয়ে প্রতিভা লতিকা এবং নীলিমার কাছে এল। অমিয়া ঘোষও মহিলা সমিতির কর্মী ছিল। আর তার স্বামী সিভিল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী করত। তাই সে তার স্ত্রীকে মহিলা সমিতিতে কাজ করতে, মজদুর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এবং কমিউনিস্টদের মিটিং-এ যেতে নিষেধ করত। অমিয়া ঘোষ কখনও হেসে কখনও বা ঝগড়া করে স্বামীর ওজোর-আপত্তিকে উড়িয়ে দিত। একদিন

মিঃ ঘোষ বলল, 'সরকার আমার দু ছেলেকে চাকরী দেবে না। আমার কথা যদি না শোন তবে দেখবে একদিন আমারও চাকরী চলে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও অমিয়া ঘোষ যখন তার কথা শুনল না তখন সে রেগে গেল। এত রেগে গেল যে······

অমিয়ার কথা শুনে লতিকার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সে বলল, তুই কিছু বললি না, চুপচাপ মার খেলি।

অমিয় ঘোষ বলল, আমি যা বললাম তা এখন ছেড়ে দে। প্রতিদিন তো ঝগড়া আর খিটিমিটি লেগেই আছে। ও বলে চলে, আমি শুনে যাই।

অমিয়া ঘোষের কণ্ঠির মতো ঘাড়ের ওপর নীলিমা এক লম্বা কালশিটে দাগ দেখে উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখেছ কি বেদম মেরেছে, জংলি কোথাকার।

অমিয়া ঘোষ হেসে বলল, না, খুব জোরে মারেনি, হাতে সোনার আংটি পরা ছিল তাতেই ছিলে গিয়েছে।

প্রতিভা জিজ্ঞেস করল, তুই আজকে কি বলে এলি?

অমিয়া ঘোষ বলল, দেখছিস না, বিয়েতে যাওয়ার জন্য শাড়ি পরে বেরিয়েছি। দিন দুই আগে আমার এক বড় লোক বান্ধবীর বিয়ের চিঠি চেয়ে নিয়েছিলাম। আর কিভাবে সে বান্ধবীর বিয়েতে যাওয়া বন্ধ করে?

প্রতিভা আর অমিয়া ঘোষ পরস্পরের গায়ের ওপর ঢলে পড়ে হাসতে লাগল।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন হল মেয়েদের ভীড়ে ঠাসাঠাসি ছিল। দেয়ালে ফেস্টুন টাঙ্গানো ছিল, তাতে লেখা ছিল:

"সিকোরেটি এ্যাক্টে ধৃত বন্দীদের হয় মুক্তি দাও, না হয় মামলা দায়ের কর।"

"ধর্মঘটীদের দাবী পূরণ কর।"

"রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মানবোচিত ব্যবহার কর।"

"রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও।"

"বি. সি. রায়ের বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা নয়। আমরা শ্রমিক কৃষক রাজ চাই, পুলিশ রাজ নয়।"

অমিয়া ঘোষ বলল, আর একটা পোস্টার চাই, তাতে লেখা থাকবে —পুলিশ রাজ আর রাম রাজ্যের মধ্যে কি পার্থক্য? যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে।

অমিয়ার কথা শুনে আশ-পাশের মেয়েরা হেসে উঠল। লতিকা একবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল। আজকের এই মিটিং-এ বেশীর ভাগই ছিল মহিলা শ্রমিক। মিটিং এতক্ষণ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। লতিকা এবং প্রতিভাকে আসতে দেখে স্টেজের ওপর থেকে এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা নেমে এল এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে লতিকার কাছে এসে বেশ রুক্ষ স্বরে বলল, খুব দেরী করে দিয়েছ।

লতিকা দেরী করে আসার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল।

বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, আমরা বাড়িতেও যাইনি, মিল'বন্ধ হতেই সোজা এখানে চলে এসেছি। তোমাদের কোন্ মিলে যাওয়ার ছিল।

লতিকা এবং প্রতিভা তাঁর কাছে আবার ক্ষমা চাইল, রাজিয়া বহেনজী, ক্ষমা করে দাও না।

রাজিয়া হেসে বলল, চল, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও, আমি তোমাদের জন্যে দেরী করছিলাম।

রাজিয়াকে সভাপতি করা হল। লতিকা কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তির দাবীতে একটা প্রস্তাব রেখে বেশ আস্তে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল। লতিকার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিভা খুব গরম এক ভাষণ দিল। আর হাত তালির গুঞ্জনের ভেতর দিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

সমস্ত মেয়েরা যখন দাঁড়িয়ে তালি বাজাচ্ছিল এবং শ্লোগান দিচ্ছিল, তখন একজন রাজিয়ার কাছে এক টুকরো কাগজ পাঠাল।

যে এই কাগজ পাঠিয়ে ছিল রাজিয়া তাকে স্টেজের ওপর আহ্বান করল। মহিলাটি ছিল রোগা এবং পাংশুটে, গাল দুটি ভেতরে বসা। চেহারাতে একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল, চুল আলুথালু হয়ে হাওয়ায় উড়ছিল। সে তার কালো ওড়না তাড়াতাড়ি সামলাতে সামলাতে স্টেজের দিকে ছুটে গেল এবং স্টেজের ওপর উঠেই বলতে লাগল, বোনরা, আপনারা এটা পাশ করে দিয়েছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি একটা কথা আপনাদের বলার জন্যে এখানে এসেছি।

বলে সে থামল। হলের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই সেই মহিলাটাকে দেখতে লাগল। সে আবার বলতে লাগল, কিন্তু এখনও তার কণ্ঠের ভয়ার্ত ভাব দূর হয়নি। 'আমার স্বামী একজন শ্রমিক। সে জুতোর কারখানায় কাজ করে। বেশ কয়েক বৎসর ধরে সে লাল কমরেড। কয়েকটা ধর্মঘটে সে যোগ দিয়েছে, কংগ্রেসীদের সাথে জেলেও

গিয়েছে। জেলে যাওয়া তার কাছে কোন নতুন ব্যাপার নয়। যেমন ক্ষুধায় মরা গরীবদের কাছে তেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়।'

সে আবার থামল। লতিকার মনে হল কেউ যেন তার হৃদয় চেপে ধরেছে। হলের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সেই মহিলাটি আবার বলতে শুরু করল, আগে আমাদের নেতারা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করাকে অপরাধ বলে মনে করত না। আমি জিজ্ঞেস করি, তাঁরা এখন তা অপরাধ বলে কেন মনে করে? কেউ কেউ আজকাল হরবকত বলছেন পুঁজিপতিরাও আমাদের ভাই। আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কি আগে আমাদের ভাই ছিল না? এখন কি হয়েছে?

একজন মহিলা চেঁচিয়ে বলল, এখন পুঁজিপতিরা তোমার ভাই নয়। এখন ওরা জামাই, বুঝলে জামাই।

সারা হল তার কথায় হেসে উঠল। আর খুব জোর তালি বাজতে লাগল। রাজিয়া অনেক কষ্টে সবাইকে চুপ করাল। সে মহিলাটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল, ভাই হোক আর জামাই হোক, ওরা আগেও কারখানার মালিক ছিল, আর আমরাও আগে শ্রমিক ছিলাম। আজও ওরা কারখানার মালিক, আমরা আজও শ্রমিক। আমার স্বামী আগেও ধর্মঘট করাত, এখনও করাবে। ধর্মঘট করার আজ তার কেন অধিকার নেই? তাকে কেন জেলে বন্দী করা হয়েছে? কেন তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। ইংরেজদের আমলে তার দু-তিনবার সাজা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই আদালত তাকে সাজা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী হাজির করা হয়েছিল। উকিলদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল। আর এখন? না উকিল, না সাক্ষী, না মামলা, না আইন, না কানুন, শুধু জেলের গরাদ।

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলতে লাগল, গত সাতদিন ধরে আমার ঘরে কোন খাবার নেই, কারণ ঘরে কামাই করার লোক নেই। দু-মাস ধরে আমার ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে। তাই মিল মালিক আমাকে ছাটাই করেছে। ঘরে যা কিছু সম্বল ছিল তা এক এক করে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। আমার কাছে এমন কীইবা ছিল? কালকে রাতে আমার ছেলে খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে মারা গিয়েছে। ঘরে কিছু ছিল না। কয়দিন থেকেই কিছু ছিল না। এইমাত্র আমার ছেলেকে দফন করে আসছি। সোজা এখানে এজন্যে এসেছি, আমার কালো ওড়না আমার বোনদের

সামনে মেলে ধরে তাদের জিজ্ঞেস করব, এই প্রস্তাবই কি যথেষ্ট? সত্যি-সত্যিই যদি এই প্রস্তাব যথেষ্ট হয় তবে এই প্রস্তাবের এক নকল আমাকে দাও। আমি আমার খোকার কবরের ওপর লাগিয়ে দিই।

হলের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চৈচুর হয়ে গেল। যেন কেউ বাঁধন ছিঁড়ে দিল। একসঙ্গে বহু কণ্ঠস্বর গুঞ্জন করে উঠল—

—'না, না।'

—'না, এ যথেষ্ট নয়।'

—'নিশ্চয়ই, এ যথেষ্ট নয়।'

অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল। হঠাৎ এক তরুণী শ্রমিক লাফিয়ে স্টেজের ওপর উঠল। তার পরনে ছিল ঘাগরা আর তার বেণী ক্রুদ্ধ এক নাগিনীর মতো ফোঁস ফোঁসে করছিল। সে স্টেজে উঠেই তার হাত দুটো প্রসারিত করে দিয়ে বলতে লাগল, যদি যথেষ্ট না হয়, তবে দাঁড়াও, এগিয়ে চলো··কলকাতার বাঘিনীরা, তোমরা কি তোমাদের ভাইদের স্বামীদের জেলখানায় ভুখা মরতে দেবে? উঠে দাঁড়াও। এখনি মিছিল করে জেলের দিকে চলো। আমরা আজ আমাদের দাবী পূরণ করে তবে ফিরব।

অনেকে একসঙ্গে চীৎকার করে বলে উঠল, 'হাঁ, হাঁ ঠিক কথা।' তালি বাজাতে লাগল। মিছিল বের করার প্রস্তাব সবার ঠিক মনে হল। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। রাজিয়ার খুব রাগ হল। সে দু-তিনবার টেবিলের ওপর চাপড় মেরে চুপ করাল।

একজন মহিলা বলল, কমরেড প্রেসিডেণ্ট।

রাজিয়া রেগে বলল, চুপ কর, না হলে উঠিয়ে হলের বাইরে ছুঁড়ে দেব।

আর একজন বলল, আমাকে, কিছু বলতে দাও।

রাজিয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? মহিলা সমিতির মেম্বার?

সেই মহিলাটি বলল, 'না, আমি মহিলা সমিতির মেম্বার নই।' লতিকা সেই মহিলটির দিকে তাকাল। দেখল খুব দামী বাদামী রঙের একটা শাড়ি পরে আছে সে। মাঝারি বয়সের এবং হৃষ্টপুষ্ট। সিঁথিতে সিন্দুর। হাতে সোনার চুড়ি। সেই মহিলাটি বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমি মেম্বার নই ঠিকই, কিন্তু এই জনসভায় কিছু বলার অধিকার আমারও আছে। আর যেহেতু আমি আপনাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি সেজন্যে আমাকে বিশেষ ভাবে বলতে দেওয়া দরকার।

রাজিয়া দাঁড়িয়ে বলল, এক মহিলা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চান।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' আর একবার চীৎকার চেঁচামেচি হল। পরক্ষণেই সমস্ত মহিলারা তার দিকে তাকাল। সে ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে স্টেজের দিকে এগুচ্ছিল।

'দেখ কেমন ধূর্ত শেয়ালের মতো যাচ্ছে।' একজন মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

আর একজন বলল, দেখ কেমন তেল চুকচুকে।

'চুপকর, চুপকর', রাজিয়া রাগে গর্জে উঠল। মহিলা দুজন লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

সেই হৃষ্টপুষ্ট মহিলাটি স্টেজে উঠে বলতে লাগল, বোনরা, রাজনৈতিক বন্দী এবং কমিউনিস্ট বন্দীর মুক্তির দাবীতে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। [তালি বেজে উঠল] এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন জানিয়েছেন, আমিও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। [তালি] আমি চাই কলকাতার সমস্ত মেয়েরা নিজেদের বাড়িতেও এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করুক। কিন্তু এই মিছিলের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা এই জন্যে করছি যে কলকাতায় একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। আইন ভেঙ্গে আমরা আইন থেকে বাঁচতে পারি না।

হলের পেছন থেকে একজন চীৎকার করে উঠল, কে বাঁচতে চায়?

সেই মহিলাটি বলল, দেখুন, আমরা নারী, আমাদের নিজেদের সংসার দেখাশুনা করতে হয়। নিজেদের কাচ্চা-বাচ্চা, নিজেদের আত্মীয় স্বজন, নিজেদের স্বামীদের দেখতে হয়।

নীলিমা রাগে কাঁপতে লাগল। উঠে বলল, আমার স্বামী জেলে ভুখা মরছে।

একজন মহিলা শ্রমিক বলল, সোনার চুরি খুলে কথা বল।

আর একজন বলল, ব্লাক মার্কেটের সোনা নাকি?

আর একজন বলল, আরে বোন, এর স্বামী নিশ্চয়ই গান্ধী টুপি পরে।

একেক জন একেক ধরনের কথা ছুঁড়ে মারতে লাগল। বড়-সর হাত-পা ওয়ালা এক কালো ভুজঙ্গিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোনরা, এই মহিলার স্বামীকে আমি চিনি। তিনি গান্ধী টুপি পরেন না, হ্যাট পরেন—হ্যাট!

একটি মেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?

সেই কালো মহিলাটি তার হাত দুটি কোমরে রেখে বেশ ক্রোধের সঙ্গে বলল, এর স্বামী আমাদের পাড়ায় থাকে। পুলিশ ইনেসপেক্টর। গত মঙ্গলবার সে আমার ছেলেকে লাল ঝাণ্ডার লোক ভেবে এ্যারেস্ট করেছে।

'হায়!' প্রতিভা চীৎকার করে উঠল, 'পুলিশ ইনেসপেক্টরের স্ত্রী হয়ে ও এখানে সি. আই. ডি-র কাজ করতে এসেছে। বের হয়ে যাও এখান থেকে।' প্রতিভা ইনেসপেক্টরের স্ত্রীর ঘাড় ধরল।

মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল, ছেড়ে দাও দিদি, এই বেচারীর তো রাজবন্দীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এতো শুধু মিছিলের বিরোধিতা করছে।

এক বৃদ্ধা বলল, 'আঃ, কি সহানুভূতিই না জানিয়েছে হারামজাদি।' বৃদ্ধার মাথার চুল অর্ধেকেরও বেশী সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর তার মাথা সব সময় দুলছিল। তার কথা বলার ধরন দেখে লতিকার মনে হল সে উত্তর ভারতের বাসিন্দা।

এর মধ্যে অনেকেই পুলিশ ইনেসপেক্টরের স্ত্রীকে ঘিরে ফেলেছিল। হয়তো দু'চার ঘা লাগিয়েও দিত, কিন্তু রাজিয়া বেশ চতুরতার সঙ্গে সবাইকে ঠাণ্ডা করে তাকে মিটিং-এর বাইরে বের করে দিল। মিটিং থেকে তাকে যখন বের করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে এত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল যে তার শাড়ির নীচ থেকে পিস্তল ছিটকে মাটিতে পড়ল।

অমিয়া ঘোষ পিস্তল উঠিয়ে বলল, দেখ, হারামজাদি বন্দীদের ভালোর জন্যে সম্পুর্ণ আয়োজন করে এসেছে।

অমিয়া ঘোষ তার ব্যাগে পিস্তলটি এমন ভাবে রাখছিল যেন তা লিপস্টিক। কিন্তু লতিকা তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে সেই গোয়েন্দা মহিলাটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যা, না হলে কালকেই কাগজে বের হবে রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থকদের খানা-তল্লাশ করে পিস্তল পাওয়া গিয়েছে।

লতিকা আর অমিয়া ঘোষ ইনেসপেক্টরের স্ত্রীকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন ফিরল তখন তারা দেখল অনেকেই কোমরে আচল জড়াচ্ছে। কেউ কেউ ফেস্টুনগুলো নিচ্ছে। রাজিয়ার হাতে পতাকা ছিল। যে কালো ভুজঙ্গিনী পুলিস ইনেসপেক্টরের স্ত্রীকে চিনতে পেরেছিল তার হাতেও একটা পতাকা ছিল। কেউ কেউ আবার হলের কোণে যে কলসি ছিল তার থেকে জল নিয়ে আঁচল ভেজাচ্ছিল।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, এ কি করছ?

রাজিয়া বলল, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে ভিজে শাড়ির আঁচল চোখে দেবে, তাতে কষ্ট কম হবে। চোখে কম জ্বালা করবে।

প্রতিভা বলল, যদি টিয়ার গ্যাস না ছুঁড়ে গুলি ছোড়ে?

অমিয়া ঘোষ বলল, গুলি চলবে না। যদি চলে আমি সামনে এগিয়ে যাব। পুলিশরা আমার গয়না দেখে ভাববে আমি মিছিলের মেয়ে নই —মনোরমার বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি। তাই না মনোরমা ?

মনোরমা বলল, যা পাগলী।

নীলিমার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলল, গুলিতো চলতেও পারে।

অমিয়াও গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, না, চলবে না, এ রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশ। এখানে মেয়েদের ওপর গুলি চালানোর হিম্মত কার আছে ?

লতিকা বলল, নীলিমা, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস ?

নীলিমা বলল, লতিকা, হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা।

লতিকা বলল, পাগল হয়েছিস ? আমি তো এত তাড়াতাড়ি মরার মেয়ে নই।

উত্তর ভারতের সেই বৃদ্ধা মহিলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। এই গেট দিয়ে মেয়েরা সব বের হচ্ছিল। তার হাতে ছোট্ট একটা সিন্দুরের কৌটা। সে তাদের থামিয়ে বলতে লাগল। আর তার মাথা ধীরে ধীরে দুলছিল, আমার মেয়েরা, এস তোমাদের সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিই। এ আমাদের বিজয়ের লাল নিশানা। আজ তোমাদের জিত হবে।

লতিকা তার মাথা নিচু করল। তার কপাল লাল টিপে ঝকমক করে উঠল।

কপালে লাল সিন্দুর ঝকঝক করছিল, আর হাওয়ায় লাল পতাকা ফরফর করে উড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে আরম্ভ করল। ইণ্টারন্যাশনাল গাইতে গাইতে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন হল ছেড়ে মেয়েদের এই মিছিল যে গ্রে কখন বাজারের কাছে এসে গিয়েছিল। আর তারা চারজন চারজন করে ভাগ হয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে এগুতে লাগল। সামনে ছিল রাজিয়া আর সেই কালো ভুজঙ্গিনী। আর তাদের পেছনে ছিল লতিকা আর নীলিমা, প্রতিভা আর মনোরমা। গীতা সরকার আর অমিয়া ঘোষ ওদের পেছনে পেছনে এগুচ্ছিল। লতিকা একবার পেছন ফিরে দেখল। মিছিল বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে চলেছে। তাদের বিপ্লবী শ্লোগানগুলি চারদিকে গমগম করছিল। লতিকা দেখল বাজারের সমস্ত পরিবেশ যেন এক বিদ্যুতের ঝটকায় নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল। অনেকে মেয়েদের এই সাহস দেখে তারিফ করতে লাগল। কারণ তারা তাদের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙ্গে অনশন ধর্মঘটীদের সমর্থনে মিছিল বের

করেছিল। বড় বড় দোকানদাররা দোকান বন্ধ করতে লাগল। অনেকে বড় রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরল।

কেউ কেউ মিছিলের সঙ্গে যোগ দিল। বৌবাজারের ওপরের উঁচু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মহিলারা মেকআপ করে হাসছিল। একটা ট্রাম ইলেকট্রিক তারে ছড় টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। লতিকা এগিয়ে যেতে যেতে ট্রামের ইলেকট্রিক তার দেখছিল। জয়েণ্টের জায়গায় বিদ্যুতের এক স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। লতিকা শিউরে উঠল। যেন সমস্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে উঠেছিল। পা এগিয়ে চলেছিল। কণ্ঠে ছিল টগবগে গান। কিন্তু গানের কলিগুলি ভেতর এবং বাইরে ভেঙ্গে চুড়ে ওর সামনে এবং পেছনে ঝুকে অসংখ্য চিন্তা আগু-পিছু-হতে লাগল আর তা যেন পরস্পরের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে জটপাকিয়ে যাচ্ছিল···কাকিমার মুখের ওপর বাদামী রঙের আঁচিল কি সুন্দরই না লাগে···আজকে আমার স্বামীর সঙ্গে কেন দেখা করিনি ···ট্রামের ছড় কি ভাবে ছুটে যায়···নীলিমার নাক···আজ আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভালোই হত···গুলি চলতে পারে···নাও চলতে পারে ···চলতে পারে···নাও চলতে পারে···ঐ যে জিপ আসছে! লতিকার চিন্তা জিপ গাড়ির সঙ্গে চিপকে গেল। ওর মাথায় এখন আর কোন চিন্তাই ছিল না। সামনে থেকে জিপ গাড়ি আসছিল। জিপের ওপর ওয়ারলেস যন্ত্র লাগানো ছিল আর জিপে পুলিশ অফিসার বসেছিল। মিছিল সামনে এগিয়ে চলেছিল। আর সেদিক থেকেই জিপ ছুটে আসছিল। জিপ আরও সামনে এগিয়ে এল। জিপে পুলিশ বসেছিল, তাদের হাতে ছিল রাইফেল। জিপ এগিয়ে আসছিল, মিছিলও এগুচ্ছিল। আর লতিকার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, হৃদয় জিপের সঙ্গে চিপকে গিয়েছিল। মিছিলের সামনে এসে একটু দূরে জিপ থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লতিকা যেন ধাক্কা খেল। ওর এক এক করে মনে হল আজ খোকনের প্যাণ্ট ধুতে দেওয়া হয়নি। তারপর সে আর কিছু মনে করতে পারল না। যেন মস্তিষ্কের ওপরের উজ্জ্বল কাঁচের স্তর ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গিয়েছে। আর সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া কাঁচের ছিদ্র দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে দেখছে। পুলিশ মিছিল আটকে দিয়ে ছিল। আর একজন অফিসার বলছিল···'মিছিলকে সামনে যেতে দেওয়া হবে না।'

লতিকার পা আপনা থেকেই সামনে এগিয়ে গেল।

পা থামবে না, ঝাণ্ডা উড়বে।

'শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে, মিছিল বের করা আইন-বিরুদ্ধ।'

অনশন ধর্মঘটীরা জেলের গারদে পেছন থেকে ঝুঁকে দেখছে। মেয়েরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

'—আমি হুকুম দিচ্ছি, মিছিল ভেঙ্গে দাও।'

এই হুকুম লতিকার কাছে কেমন নাকি নাকি মনে হল, যেন ওপরের তাকে রাখা কোন পুতুল কথা বলছে।

মিছিল সামনে এগিয়ে গেল, লাল সিঁদুরের টিপ সারবন্দী হয়ে এগিয়ে চলেছে।

'ছত্রভঙ্গ হয়ে যাও। না হলে···'

না হলে? লতির মস্তিষ্কের পেছনের চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। আর একটি অদ্ভুত মুখ ভেসে উঠল।

এ কার চোখ? এ কার মুখ? হাঁ! এ তার স্বামীর মুখ।

সিঁড়ির ওপর খোকন দাঁড়িয়ে ছিল, পাতলা পাতলা কাঁচ জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

লতিকার হঠাৎ মনে হল যেন আগুনের কণা ট্রামের বৈদ্যুতিক তারের মতো ওর পেটের মধ্যে ঘুরছে। আর ও যেন জয়েণ্টের নিচে ছিটকে পড়েছে! খোকন সিঁড়ির নিচে ছিটকে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এরই মাঝে যেন আলোর একটা রশ্মি চমকে উঠল, যেন আধখানা ভাবনা, চার ভাগের এক ভাগ ভাবনা; দুটো চোখ, একটি মুখ···আবার অন্ধকার···।

গুরুম······গুরুম······গুরুম······

রাজিয়া চীৎকার করে বলল, মাটিতে শুয়ে পড়।

সনসন শব্দে একটি গুলি রাজিয়ার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। রাজিয়া মাটির ওপর শুয়ে পড়ল।

সমস্ত মিছিল মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। বেশ্যাপট্টির দরজাগুলি বন্ধ হতে লাগল। চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। তারপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। হাওয়াতে শুধু গুলির সনসন আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল।

নীলিমা কাঁধ ঝুঁকিয়ে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া চোখ, মাথা আর কানকে হাত দিয়ে ঢেকে গলির দিকে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে এগুতে লাগল। ওর হাত অমিয়া ঘোষের হাত ধরে ছিল। যে হাত আগে চলছিল সেই হাত থেমে গেল, যে হাত গরম ছিল সেই হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নীলিমা ওর হাত ছেড়ে দিল। কার বরযাত্রী চলে গেল! অমিয়া! নীলিমা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে এগুতে লাগল। কিছুটা এগুনোর পর ও পিছলে গেল, আর ওর হাত কারও রক্তের ওপর গিয়ে পড়ল। রক্তে হাত পড়তেই নীলিমা আস্তে চীৎকার করে উঠে দেখল, প্রতিভা মরে পড়ে আছে আর তার আঁচলে বাঁধা শালগম খুলে গিয়ে রক্তে ভিজে গিয়েছে। শালগম আর মাছের ঝোল! প্রতিভা তুই আজকে স্বামীকে কি খাওয়াবি? নীলিমা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে এগিয়ে চলল। একটা গুলি ডানদিক থেকে ছুটে এল আর কে যেন তার পেছনে চীৎকার করে উঠল। মুহূর্তের এক তীক্ষ্ণ চীৎকার—যেখানে জীবনের পরিসমাপ্তি হয় আর মৃত্যুর শুরু হয়ঃ ওটা ছিল গীতা সরকার। মাথা ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। কাছেই একজন তরুণ মরে পড়েছিল। বুট পালিশের কৌটা আর বুরুশ ওর হাতের মুঠোয় ধরা। নীলিমার দাঁত ঠকঠক করে বাজতে লাগল, আর ও চীৎকার করছিল।

রাজিয়া ছুটতে ছুটতে ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? তোমার কোথাও লেগেছে?

নীলিমা ঘাবড়িয়ে গেল। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা লাশ মাটিতে পড়েছিল। কেউ কেউ কাতরাচ্ছিল আর একজন নর্দমার কাছে—দোকানের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল।

পুলিশরা একটু পিছু হটে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত বাজার নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গিয়েছিল।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

রাজিয়া বলল, যা কিছু হবার হয়ে গিয়েছে, চল লতিকার কাছে যাই।

নীলিমা নিজে নিজেকে দেখল। ওর কোন আঘাত লাগেনি, ও যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাজিয়ার হাতে একটা গুলি লেগে ছড়ে গিয়েছিল।

রাজিয়া আর নীলিমা লতিকার কাছে গেল, দেখল লতিকা খুব আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে। ওর পাশেই মনোরমা মুখ খুলে পড়ে আছে। আর ওর হাত দুটো কানের ওপর।

নীলিমা বলল, ওঠ, মনোরমা ওঠ! দেখ, লতিকা কাতরাচ্ছে। চল, ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাই।

রাজিয়া বলল, কাকে উঠাচ্ছ? মনোরমা তো আর উঠবে না। ও আর কারও কথা শুনবে না।

নীলিমা খুব আস্তে মনোরমার হাত তার কানের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। একটা দুল ওর কান থেকে খুলে গিয়ে নীলিমার হাতে পড়ল। মনোরমা সত্যিসত্যি ঘুমিয়ে ছিল। ওর বুকে একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন। ওর চোখ বন্ধ। ওর ঠোঁট শুকনো, ওর কুমারী বুকের সমস্ত মমতাকে কেউ যেন শুকিয়ে দিয়েছিল।

লতিকা গোংগিয়ে উঠল, আঃ।

রাজিয়া এবং নীলিমা চারদিকে তাকাল। কেমন একটা স্তব্ধতা, বায়ুমণ্ডল যেন তার হাওয়াকে থামিয়ে দিয়েছে আর পৃথিবী যেন অক্ষরেখায় ঘোরা বন্ধ করে দিয়েছে।

জুতার এক দোকানের ওপর ঝুলন্ত বারান্দা থেকে একজন বৃদ্ধ চীনা ঝুঁকে দেখছিল। রাজিয়া তাকে নীচে নেমে আসার জন্যে ইশারা করল। বৃদ্ধ চীনা খুব মনোযোগ দিয়ে নীচে দেখল। তার দোকান বন্ধ ছিল। ভেতর দিয়ে বাইরে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঝুলন্ত বারন্দা থেকে রাস্তায় নামার জন্যে একটা সিঁড়ি ছিল, কিন্তু সেই সিঁড়ি বাইরের দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ছিল। কিন্তু সেখানে সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি পুলিশের জিম্মায়। আর কোন আশ্রয় ছিল না।

বৃদ্ধ চীনা সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে মাকড়সার মতো দেয়াল বেয়ে বেয়ে কোন মতে নীচে নেমে এল। নীচে নেমে সে খুব তাড়াতাড়ি দোকান খুলল এবং নীলিমা এবং রাজিয়ার সাহায্যে লতিকাকে উঠিয়ে দোকানের নিয়ে গেল।

দূরে দাঁড়িয়ে পুলিশরা মজা দেখছিল।

বৌবাজারের দালানের উঁচু বারন্দায় দাঁড়িয়ে মহিলারা কাঁদছিল।

মিছিল আবার জেগে উঠতে লাগল। মেয়েরা মাটি থেকে উঠে—যারা আহত হয়েছিল তাদের দেখতে লাগল—সাথীদের লাশ দেখতে লাগল।

গীতা সরকার

আমি গীতা সরকার। আমার বয়স আঠারো বৎসর। আমার মা-বাবা খুব গরীব। তাই আমি জানি দারিদ্রতা কি? আর. জি. কারমায়কল কলেজের আমি একজন নার্স। একজন ছেলেকে আমি ভালোবাসি। তার নাম অজিত বোস। সামনের বছর সে ডাক্তারি পাশ করবে। পাশ করার পর আমাদের বিয়ে হবে।

গুড়ুম!

অমিয়া ঘোষ

আমি হাসিখুশি রঙিন পাখি, যে পাখি শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে উড়ে বেড়ায় আর আকাশের নীল ঝিলের স্বপ্ন দেখে। রাত্রে সে তার ছোট্ট বাসায় বসে নিজের ডানে আর বাঁয়ে দুটি বাচ্চাকে শুইয়ে তারপর নিজের দুই ডানা মেলে শুয়ে পড়ে। বাচ্চারা কত আদরেরই না হয়। বাসা কত আরামদায়কই না হয়। আজ আমার দুই বাচ্চাকে একটা ছোট্ট গল্প শোনাব। আর ওরা আমার নরম নরম বুকে লুকিয়ে তাদের সুন্দর চোখ খুলে আমার গল্প শুনবে। তারপর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে।

গুরুম!

মনোরমা

মিটিং শেষ করে আমি ছ'টার সময় ওডিয়ন সিনেমার সামনে তোমার সঙ্গে দেখা করব। না, উলঙ্গ মেয়েদের সাঁতার কাটা রঙিন ছবি আমি দেখব না। করুণা আর মানবতার প্রতিমূর্তি চার্লি চ্যাপলিনের ফিল্ম আমি দেখব। সামনের সপ্তাহে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে বিয়ের পরও এই ফিল্ম দেখব। আর তারপর বর্ধমানে তোমাদের বাড়ি যাব, যেখানে উঠোনে তুলসির গাছ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে আমরা দুজন দুজনের হাতে হাত রেখে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকব, আর আসন্ন সন্তানের কল্পনা করব। সেই আসন্ন শিশুর সুগন্ধে তুলসির চারা মঞ্জরিত হয়ে উঠবে। মিটিং থেকে বেরিয়ে আমি ঠিক ছটার সময় ওডিয়ন সিনেমার গেটের কাছে পৌঁছে যাব। আমার জন্যে অপেক্ষা কর।

গুরুম!

প্রতিভা

কত দিন থেকে তোমার জন্যে প্রতিক্ষায় আছি, একবার তুমি এস।

ও আমাদের দুজনের সন্তান। আমরা দু'জনই গরীব। ওর জন্যে কিছু করতে পারিনি। কিন্তু এই সন্তানের ভবিষ্যত খুব ঐশ্বর্যশীল। কারণ ও সেই যুগের সন্তান যে যুগে আমাদের আশায় উজ্জ্বলতা আছে। থরো থরো কম্পমান প্রসন্নতার কিরণ সামনে থেকে আসছে···, কতদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষায় আছি, একবার তুমি এস।

গুরুম!

আমার কোন নাম নেই। আমার বাবার কোন নাম নেই। আমার মার কোন নাম নেই। কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে আমার জন্ম। দারিদ্র আর পুঁজিবাদের আমি মিলিত সন্তান। এই মিলনই আজও কলকাতার আত্মাকে এক জোঁকের মতো চুষছে। আমি জুতা পালিশ করি। মানুষ মুখকে ঝকঝক করে তোলে আর আমি জুতা ঝকমক করি। মানুষ মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারে, আমি জুতার চেহারা দেখে বুঝতে পারি। আমি অবহেলায় বেঁচে আছি। আমি ফুটপাতে শুই, আর হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাই।

আমার কোন নাম নেই। আমি এই মেয়েদের বাঁচাতে এখানে এসে ছিলাম। আমি জানি না এ কিসের মিছিল ছিল? শুধু এইটুকুই জানি, মেয়েদের ওপর গুলি চালালে পুরুষদের সামনে যেতে হয়। কারণ মেয়েরা হচ্ছে পুরুষদের মা, আর মাকে বাঁচানো প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য, সেই মা সন্তানকে নিজের সন্তান বলে ডাকুক আর না ডাকুক।

আমার কোন নাম নেই। আমি সেই নামহীন একজন সাধারণ কবি, যে প্রতি শতাব্দীতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে মারা গিয়েছে। আমি সেই নামহীন সৈনিক যে প্রতিটি মোর্চায়, প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে অমর হয়ে রয়েছে। আমি সেই মহামানব, যাঁর দেবতাদের মতো কৃপাবান আর কর্মিষ্ঠ হাতে বিপ্লবের পতাকা উড়ছে।

আমার কোন নাম নেই। আমি বোধহয় আমার মাকে খুঁজতে এসেছিলাম।

গুরুম!

বৃদ্ধ চীনার দোকানে নীলিমা লতিকার মাথা তার কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, লতিকা এখন কেমন আছিস? লতিকার মুখে কাকিমার মতো এক হাসি খেলে গেল। বলল, ভালো আছি। পেটে সামান্য একটু ব্যথা।

রাজিয়া বলল, এ্যাম্বুলেন্স এখনই এসে যাবে হয়তো। বুড়ো চীনাকে ভগবান ভালো করুক, এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ও এইমাত্র ফোন করেছে।

বৃদ্ধ চীনা এই সময় দোকানের ভেতর থেকে একটা বুটি নিয়ে এসে বলল, 'এই বুটিটা পেটের ওপর রেখে দাও।' রাজিয়া জিজ্ঞেস করল, এ দিয়ে কি হবে?

বৃদ্ধ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, এতে কিছুই হবে না, কিন্তু আমি কি করব···বল, কি করব···কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাজিয়া বলল, চুপ করে বস, এ্যাম্বুলেন্স আসছে হয়তো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলতে লাগল, এ চিয়াং, এসব চিয়াং-এর শয়তানি। আমি সব জানি।

রাজিয়া বৃদ্ধকে বলল, কি বোকার মতো বলছ, এখানে কোথা থেকে চিয়াং আসবে ?

বৃদ্ধ চীনা হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'চিয়াং-ই হবে। তুমি জানো না। আমি সারা দুনিয়া ঘুরেছি। সমস্ত দেশেই চিয়াং আছে—ছোট চিয়াং, বড় চিয়াং আর তার থেকেও বড় চিয়াং'···বৃদ্ধ চীনা তার হাত প্রসারিত করে এক বিরাট চিয়াং-এর চেহারার বর্ণনা দিতে দিতে বলল, আর এই চিয়াংরা এক হয়ে আমাদের লুট করছে, আমাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে।

বৃদ্ধ চুপ হয়ে গেল। লতিকা খুব আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছিল···কানে ঘড়ি টিক টিক করে চলেছিল।

বৃদ্ধ আবার বলল, 'সমস্ত চিয়াংদের খতম করতে হবে। আর কোন পথ নেই। শুধু পিকিং-এর রাস্তা আছে, সেখানে আমাদের ফৌজ আনন্দে বিউগল বাজাতে বাজাতে ঢুকছে।' বলতে বলতে বৃদ্ধের শোকাতুর মুখের ওপর আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। পিকিং-এর নাম শুনে লতিকার মুখের ওপর এক অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। জিজ্ঞেস করল, আর কত দূর ?

রাজিয়া বলল, আসছে···এই যে এসে গিয়েছে।

দোকানের সামনে একটা এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল।

রাজিয়া বলল, লতিকা ভয় পেয় না, তুমি বেঁচে যাবে।

লতিকা খুব আনন্দের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ আমি জানি, আমি মরব না।

এ্যাম্বুলেন্স লতিকাকে নিয়ে চলে গেল।

রাজিয়া পড়ে-থাকা পতাকাটা তুলে নিল। এই পতাকা এত লাল কেন ? কেন এত ঝলমল করছে ? কেন এর ঝলমল এত ক্রোধে ভরা ? কালো ভুজঙ্গিনী অমিয়া ঘোষের লাশ তার কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বাকী লাশগুলি সব উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মিছিল আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। দোকানগুলি খুলতে লাগল। মানুষ রাগে ফুসতে ফুসতে কথা বলছিল। মিছিল যতই এগুতে লাগল ততই বড় হতে লাগল। হাওয়ার ঝাপ্টা ক্রমশ খুলে যাচ্ছিল, যেন কলকাতার শৃঙ্খলিত হৃদয় তার শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে মিছিলে সামিল হচ্ছিল। দশ, বারো, পনেরো, বিশ, শ', হাজার হাজার মানুষ এসে ঐ মিছিলে সামিল হল আর শ্লোগান দিতে লাগল—

ঘৃণা আর ক্রোধে ভরা শ্লোগান দিতে লাগল। এখন আর গুলি বা একশ' চুয়াল্লিশ ধারার ভয় কাউকে চেপে ধরল না। মেয়েরা শহীদের রক্ত তাদের কপালে লাগিয়ে নিল, আর বুক টান করে এগিয়ে যেতে লাগল। সিপাইরা পিছু হটতে লাগল। মিছিল সামনে কলকাতার বাজারে, কলকাতার অলিতে গলিতে এগিয়ে গেল। সিনেমার হল থেকে মানুষ বেরিয়ে এল। কারখানা থেকে বেরিয়ে এল। শ্রমিকদের নেতৃত্বে কেরানী দোকানদার ছাত্র সামনের দিকে এগিয়ে চলল। মিছিল জেলখানার দিকে এগিয়ে চলল। জনতা এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল আর জালিম মাটির নীচে গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল।

এ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছিল। তার হর্ণ সমানে বিরক্তিকর ভাবে বেজে চলেছিল, আর তার শব্দে লতিকার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কেন এই শব্দ হচ্ছে? এই শব্দ আমার পেটের মধ্যে হাজার হাজার গুলির মতো কেন পাক খাচ্ছে? এই ঘা দিয়ে কি ঢুকছে, যেন সারা শরীরে কেউ সূই ফুটিয়ে দিচ্ছে। পেটের মধ্যে ব্যথার ঢেউ উঠে ঘোরপাক খাচ্ছে। ঘূর্ণিপাক, জ্বলন্ত অঙ্গার, ভূমিকম্প, জ্বলন্ত লাভা, আঃ! শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জ্বলে যাওয়াকেই কি মৃত্যু বলে!

এ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছিল। আর তার লোহার জালের বাইরে ছিল জীবন। লতিকা আশার চোখ নিয়ে বাইরে তাকাল। এক পাঁচতলা দালানের সামনে দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে। লতিকা দেখল, জানলায় একটা রঙ্গীন পর্দা উড়ছে। দুজন ছেলে সিগারেটে টান দিতে দিতে ব্যালকনি থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে হাসছে। একজন দর্জি গোলাপী রঙের সাটিনের ব্লাউজ সেলাই করছে···মা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চা লাফাচ্ছে আর হাসছে···ওপরের আকাশ গাঢ় নীল। লতিকা চোখ বন্ধ করে নিল। যেন তার মৃত্যুগামী শরীর আর হৃদয়ে শান্তি এসেছে। আর তার হৃদয়ে শান্তির ঘণ্টা-ধ্বনি হচ্ছে। মৃত্যু যেন তুচ্ছ ব্যাপার। জীবনই সব কিছু। মৃত্যু যেন কিছু নয়, শিশুর হাসিই সব কিছু। ও যেন দূরে জানালার কাছে দাঁড়ানো মার কোল থেকে শিশুকে ক্ষণেকের জন্যে নিজের কোলে তুলে নিল। আর তখনি তাকে চুমু খেয়ে আবার তাকে মার কোলে ফিরিয়ে দিল। জীবন থেকে মৃত্যু, আর মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ··।

লতিকা যেন তার জীবনের অন্তিম ক্ষণেও উষার প্রথম কিরণের মতো হাসল।

মর্গ।

মর্গে ছ'টি লাশ পড়েছিল।

১—লতিকা সেন!

২—অমিয়া ঘোষ!

৩—প্রতিভা গাঙ্গুলী!

৪—গীতা সরকার!

৫—মনোরমা!

৬—এক নামহীন ছেলে!

ছ'টি লাশই মর্গে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ওদের দেহে কোন কাপড় ছিল না। মর্গের কর্মচারীরা যেন মানুষের বেশধারী চিল আর শকুনের-এর মতো। তারা এই গলিত সমাজে গলিত মাংসের ব্যাপারি। তারা লাশ নিয়ে তাদের বিশেষ অশ্লিল, আর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে এমন ঢং-এ কথা বলছিল—মজা করছিল। লাশগুলিকে তাদের অশ্লিল ব্যঙ্গের নিশানা করছিল।

—'শালি বেশ দেখতে।'

Discovery of India.

—'কি সুন্দর গোলগোল আর নাদুস নদুস।'

Bardoli.

'ওর শরীরের দিকে একবার চেয়ে দেখ, কি মাস্টারপিস লেডি!'

My Experiencc with Truth.

'এর মাংস এখনও গরম আর নরম আছে।'

Satyameva Jayate.

নীলিমা এইমাত্র তার নার্সের ডিউটিতে এসেছে। ওপরের দিকে সে চোখ তুলে তাকাল। আকাশ ছিল উলঙ্গ। পৃথিবী উলঙ্গ, সূর্যের কিরণ উলঙ্গ, সতি আর সাবিত্রীর দেহ উলঙ্গ। আর মর্গ থেকে বহু বহু—হাজার হাজার মাইল দূরে ওয়ারল্ড রুফ এস্টোরিয়া হোটেলের জাঁকজমক লাউঞ্জে-মিসেস বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত বলছিলেন, 'ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কোন দিন আসবে না, কারণ ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে সমাজতন্ত্রীদের একজনও প্রতিনিধি নেই।' হাঁ, সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধি ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে নিশ্চয়ই নেই কিন্তু কলকাতার এই মর্গে অবশ্যই আছে। প্রতিনিধি কলকাতার জেলে বন্দী আছে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। ওয়ারল্ড রুফ এস্টোরিয়া হোটেলের মার্কিনী উষ্ণতা সত্যিই খুব সুন্দর। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্য

নির্দ্ধারণ এখন আর এই হোটেল আর এই বাড়ি করবে না। নীলিমার মনে হল, আজ ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্দ্ধারণ কলকাতার মর্গে হচ্ছে, কলকাতার জেলে হচ্ছে, কলকাতার রাস্তার ওপর হচ্ছে। নীলিমার ইচ্ছে করল, হাজার হাজার মাইল দূরে মিসেস বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতকে ডেকে বলে, ভারতবর্ষের এই খোলা পার্লামেণ্ট, যে পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের রাস্তায়, কলে কারখানায়, ঘরে আর আঙ্গিনায় বসেছে, এসে দেখে যাও সেখানে সমাজতন্ত্রীদের কোন প্রতিনিধি আছে কি নেই ?

নীলিমা পাঁচটা লাশের দিকে আবার তাকাল।

পবিত্র উলঙ্গ লাশ—যেন উজ্জ্বল চকচকে নাঙ্গা স্ফুলিঙ্গ—যেন সৃষ্টির থরোথরো বিদ্যুৎ। ঠিক যেমন ইনক্লাব নিজের রক্তে হাসে আর জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে অঙ্গারের ফুল হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে এই লাশগুলি উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ ধরে মর্গের কর্মচারীরা ঠাট্টা তামাশা করছিল।

অনেকক্ষণ ধরে নীলিমা, নারী নীলিমা, এই হাসপাতালের নার্স নীলিমা মর্গের কর্মচারীদের লাশ ঢেকে দেওয়ার জন্যে বলছিল।

অনেকক্ষণ ধরে তারা হাসি-ঠাট্টা করছিল আর নীলিমার কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছিল।

নরম মেজাজের নীলিমার মুখ হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠল। ওর হাতের মুঠি খুলে গেল। ও দু'হাত দিয়ে তীব্র বেগে নিজের শাড়ি খুলে ফেলে লাশগুলি ঢেকে দিল।

ও সবার সামনে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কার এমন সাহস ছিল যে ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়। সেই সময় ও যেন শিবের তৃতীয় নেত্র হয়ে উঠেছিল। যার দিকে তাকাত সেই ভস্ম হয়ে যেত। সিপাইও লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। শুধু নীলিমা একা শহীদদের লাশ পাহারা দিচ্ছিল।

এর মধ্যেই কয়েকজন সাদা চাদর নিয়ে এল।

রাত্রি অনেক গভীর হয়েছিল, কিন্তু আজকে কলকাতার চোখে ঘুম নেই। মানুষ বাজারে আর অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ-ই রেহাই পায়নি। কেউ ক্রোধ আর ঘৃণার হাত থেকে পালিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারেনি। পুঁজিবাদের বিভেদের রূপ—তার ধোকা আর আত্ম প্রবঞ্চনা সমস্ত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নীলিমা তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছিল, হাটতে হাটতে ভাবছিল, আর দেখছিল। যেন আজ

কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে তাদের ব্যগ্র হাতের মুঠো বারবার খুলছে আর ইনকিলাবি শ্লোগান দিতে দিতে গলি-ঘুঁচিতে জনতার শত্রুদের খুঁজছে।

কাকিমা বহুক্ষণ ধরে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের জল বাড়তে দেখেছিলেন। খোকন এখন পর্যন্ত ঘুমায়নি। ও আজ কেমন উদাস উদাস ছিল, ও বুঝতে পারছিল না, কি তাকে এমন উদাস করে দিয়েছে। অলি-গলি আর বাজারে শ্লোগান গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কখনও কোথাও চাপা আবার কখনও কোথাও জোর চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। কোথায় যেন দূরে বোমার শব্দের সঙ্গে চীৎকারের আওয়াজও ভেসে আসছিল। কখনও বা ছুটে পালিয়ে যাওয়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আবার পরমুহূর্তেই শ্লোগানের ঝড় মিলিয়ে যেতে না যেতেই স্তব্ধতা ছেয়ে যাচ্ছিল।

এমনই এক স্তব্ধতার মধ্যে নীলিমা লতিকার বাড়িতে এল। কাকিমা সিঁড়ির বাতি জ্বালিয়ে নীলিমার মুখ দেখেই সব বুঝে নিলেন। কারণ তিনি জীবনভর শুধু অশ্রু বুনেছেন আর অশ্রু কেটেছেন। আর তাই তিনি এই ফসল ভালোভাবেই চেনেন।

নীলিমা কাকিমাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে কি যেন বলছিল। কাকিমা তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিলেন। বললেন, আর কিছু বলার দরকার নেই, তোমার মুখই আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছে। বল ও এখন কোথায়?

নীলিমা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, শহর থেকে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে এক প্রাচীন ঘাটের চিতায় আছে।

কাকিমার চোখের শোকার্ত মণি ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল। তারপর আবার থেমে গেল। সিঁড়ির জানলা তিনি জোরে চেপে ধরলেন।

খোকন জিজ্ঞেস করল, মা কোথায়?

নীলিমা বলল, মা আসবে না।

খোকন জিজ্ঞেস করল, মা কেন আসবে না?

নীলিমা বেশ কষ্টে বলল, মা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

কাকিমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি কোথায় বিশ্বকবি? তুমি ছোট্ট চাঁদের কবিতা লিখেছিলে, সে কবিতায় বাচ্চা হারিয়ে যায়, আর মা তাকে জুঁই ফুলের মধ্যে খোঁজ করে। আজ কলকাতায় মা'রাই জুঁই ফুল হয়ে গিয়েছে। আর শিশুরা তাদের কলকাতায় অলিতে-গলিতে খুঁজে ফিরছে। বিশ্বকবি তুমি কোথায়?

খোকন খুব আস্তে কাকিমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকিমা 'তুমি কাঁদছ কেন ? আমি জানি মা কোথায় গিয়েছে ?

—'কোথায় গিয়েছে ?'

'মা ইউ. জি. গিয়েছে। যেমন আমার বাবা ইউ. জি. গিয়েছে। আমিও একদিন বড় হয়ে ইউ. জি. যাব আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। কাকিমা কেঁদো না।' নীলিমা তার চোখের জল না মুছেই খোকনের হাতে লতিকার কেনা বাঁশিটা দিল।

বাঁশি দেখে খোকনের মনে হল সে যেন তার মার হাসি হাসি মুখ দেখছে। আর ও যখন বাঁশী ঠোটে লাগাল তখন নীলিমার মনে হল লতিকা যেন তার মমতায় ভরপুর ঠোঁট দিয়ে তার আদরের সন্তানকে চুমু খাচ্ছে।

বাইরে ঝড়ের গর্জন হচ্ছিল।

ভেতরে খোকন বাঁশী বাজাচ্ছিল।

দুর্ভিক্ষ ফলাও

খাদ্য-সমস্যা আমার ডিপার্টমেণ্টের অধীন। প্রত্যেকেই জানেন এই সমস্যা ভারতবর্ষে কি প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা কয়েকটি কার্যকারী পন্থা গ্রহণ করলাম। প্রথমে তো আমরা 'টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' এবং 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর পৃষ্ঠায় 'ধান ফলাও' আন্দোলন আরম্ভ করি। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হয়নি, হয়নি তার কারণ আমাদের কৃষকরা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়তে পারে না। যদি তারা তা পড়তেও পারত কিন্তু এর ওপর তারা লাঙ্গল চালাতে পারত না।

এই পরিকল্পনাকে কার্যকারী করায় জন্যে প্রয়োজন ছিল জমি এবং ট্রাক্টর, কিন্তু আমরা তার বদলে রোটারি প্রেসের প্রয়োগ করি। রোটারি প্রেস নিঃসন্দেহে এক প্রয়োজনীয় যন্ত্র, কিন্তু তা শুধু শব্দসম্ভারই উৎপন্ন করতে পারে—কিন্তু চালের একটি কণাও উৎপন্ন করতে পারে না। সব সময় আমরা যা করি সেই বিপরীত উপায়ই আমরা প্রয়োগ করলাম, ফলে আমরা অসফল হলাম।

এরপর আমরা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের ভাষণ এবং বক্তব্য উৎপন্ন করলাম। তারপর বিজ্ঞাপণ, বড় বড় পোস্টার এবং সরকারী কর্মচারীদের এক বিশাল বাহিনী উৎপন্ন করলাম। আর এই কর্মচারীরা কাগজ এবং কলম নিয়ে তাদের টেবিলের ওপর ফসল উৎপাদনের জন্যে প্রচেষ্টা চালাল। কাগজ এবং কলম আমাদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু কাগজ এবং কলম জমি এবং বীজ নয়।

ফসল ফলানের জন্যে আমাদের প্রয়োজন জমির, আর সেই জমি আছে গ্রামে—অফিসের ছাদে নেই। সেজন্যে এই উপায়ও অসফল হল।

স্বাধীনতার প্রথম বছরে এই সব হয়েছিল।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছরে আমরা এক নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবলাম। ভারতবর্ষে এখন এক নতুন চিন্তার প্রয়োজন, আর এমন এক মহামানবের প্রয়োজন যিনি নতুন নতুন চিন্তার জন্ম দিতে পারেন। গত তিন বছর ধরে আমরা এই ধরণের নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

অন্নের যে অভাব সে সমস্যার সমাধান আজও হয়নি, তাই একজন নতুন মানুষ এক নতুন ভাবনা নিয়ে দেশের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দাও' আন্দোলন শুরু হল, কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানালেন।

আমি গরীব মানুষ, তাই কিছু না বুঝেই আট মাস আগে থেকেই এর আয়োজন শুরু করেছিলাম। আমি প্রতিদিন এক বেলা খাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না এই শুভ কাজ আরম্ভ করার জন্যে বড় বড় নেতা আর সংসদ সদস্যরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিল। এখন যখন আমি এই মহান আদর্শ এবং মহা পরিণাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি তখন আমি ঠিক করলাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই আদর্শ এবং পরিণাম ছড়িয়ে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত হব। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে, তাই এই পরিকল্পনার সাফল্য গ্রামের মানুষের ওপরই নির্ভর করে।

যখন আমি আমার পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামে পৌঁছলাম, তখন আমি এক স্থির বিশ্বাস উপনীত হলাম। এই গ্রাম ছিল বোম্বাই থেকে তিরিশ মাইল দূরে। যখন আমি মানুষজনের কাছে আমার পরিকল্পনা রাখলাম এবং এর জাতীয় তাৎপর্য এবং মহান উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করলাম তখন তারা আমাকে এক গাছের সঙ্গে বেঁধে বলতে লাগল, "এই ছোকরা শোন, আমরা তোমার দেশ-প্রেমের ভাবনার জন্যে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু তোমরা এক বেলা খাওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছ তা আমরা গত দু'শ বছর ধরেই চালিয়ে আসছি। কখনও কখন আমরা এক বেলা তো দূরের কথা দু বেলাই না খেয়ে আছি। সুতরাং তোমার শহরের চাল এখানে চালতে এস না। এবার তোমাকে শুধু গাছের সঙ্গে বাঁধলাম, যদি আর কোনদিন আস তবে তোমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেব।

আমার বিশ্বাস, আমার মতো অন্য যুবকরাও গ্রামে গিয়ে এই একই অনুভব লাভ করেছে। এই জন্যেই বোধ হয় এই আন্দোলনের আর কোন সাড়া-শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাছাড়া স্বাধীনতার দ্বিতীয় বৎসরও অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং নতুন ধরণের কোন ভাবনার প্রয়োজন আমাদের ছিল। তা না হলে জনসাধারণের একঘেয়েমি অনুভব হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভারতবর্ষের জনসাধারণ পুরানো চিন্তাধারায় খুব তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে যায়।

স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষে এই সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করল এবং

চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্যে আমরা কয়েকটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলাম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমরা খাদ্য মন্ত্রীকে সরিয়ে সেখানে কানাইয়ালাল মাণিকলাল মুন্সিকে বসালাম। কয়েকজন মূর্খ আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই মন্ত্রী সরিয়ে কি লাভ হবে? খাদ্য-মন্ত্রী বদল করে খাদ্য সমস্যার তো কোন পরিবর্তন হবে না।" এই অবুঝ মানুষরা কি করে জানবে যে আমরা শুধু মন্ত্রীই বদলাইনি, আমাদের সমস্যাকেও বদলে দিয়েছি।

এখন আমাদের খাদ্য সমস্যা নিয়ে আর কোন চিন্তার কারণ নেই, কারণ আমাদের সামনে গাছ বৃদ্ধির এই আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার ভিত্তিকে দৃঢ় করা। এর নামই হচ্ছে 'উন্নতি'। কেউ যদি এই উন্নতি না দেখতে চান তবে তিনি কমিউনিস্ট বা বিদেশী এজেন্ট। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে বন্দী করা উচিত।

শ্রী মুন্সির 'গাছ বাড়াও' আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক চমৎকার চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনকে এই ভাবে দেখা যেতে পারে, বেশী গাছের অর্থ বেশী বর্ষা, বেশী ফসল আরও বেশী ফসলের অর্থ বেশী অন্ন। কি বুঝলেন আপনি? আমাদের অন্ন সমস্যা কত সহজেই না সমাধান হয়ে গেল।

কে একজন আমাকে বলেছিল এই চিন্তা শ্রী মুন্সির নিজস্ব নয়, রাশিয়ার চিন্তা। আমাকে আরও বলা হয়েছিল রাশিয়ানরা স্তেপের যোজন মাইল লম্বা এবং চাওড়া বিশাল প্রদেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগাচ্ছে। এই খবর সত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষরা ভুলে যায় যে স্বাধীনতার তিরিশ বৎসর পরে রাশিয়ানরা যা করেছে আমরা স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষে তাই করছি। আর তা আমরা করছি কোন ব্যাপক যৌথ পরিকল্পনা ছাড়াই।

রাশিয়ার নেতাদের প্রথমে তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে এক সমাজ বিপ্লব আনতে হয়েছিল। তারপর তাঁরা বড় বড় জমিদার এবং জায়গীরদারদের জমিদারী এবং জায়গীরদারীকে কেড়ে নিয়ে সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা যৌথ কৃষি ব্যবস্থা শুরু করেন এবং তিরিশ বৎসর ধরে গভীর এবং বিভিন্ন ধরণের অনুসন্ধান চালানোর পরেই 'স্তেপের' অসমতল অনাবাদী প্রদেশকে আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করার জন্যে দৃষ্টি দিচ্ছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এই প্রাথমিক সমস্যাকেই ডিঙিয়ে গেলাম।

এখানে কোন সমাজ বিপ্লব হয়নি। কোন রাজনৈতিক বিপ্লবও হয়নি, হয়নি তার কারণ এই ধরণের বিপ্লব আমাদের অহিংসা-নীতির বিরুদ্ধে। আমরা এখানে বড় বড় জমিদারী এবং জায়গীদারী কেড়ে নেইনি—কারণ আমরা ব্যক্তিসত্তার পক্ষে।

এর সারাংশ হচ্ছে, আমরা প্রথমেই 'গাছ বাড়াও' আন্দোলন শুরু করে দিই, যে আন্দোলন আমাদের কোন ঝামেলায় ফেলবে না। এই আন্দোলনে বড় বড় জমিদারী এবং জাদগীরদারী কেড়ে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা এই ধরণের আন্দোলন আমাদের যৌথ কৃষি ব্যবস্থা চালু করার জন্যে কোন চাপ সৃষ্টি করে না। এ এক সাদা-মাঠা এবং সহজ পরিকল্পনা—যে পরিকল্পনা আধুনিক ব্যবস্থায় কোন রকম পরিবর্তন চায় না।

তাই শ্রী কে. এম. মুন্সি নকল করছেন বলে যাঁরা ধুয়ো তুলছেন তাঁরা সবাই মিথ্যাবাদী। তাছাড়া সোভিয়েত পরিকল্পনা এবং ভারতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য আছে তা লোক ভুলে যায়। সেই পার্থক্য হচ্ছে সোভিয়েত পরিকল্পনা অন্যান্য পরিকল্পনার মতো সফল হবে, আর আমাদের পরিকল্পনা, তাতো আগেই অসফল হয়েছে।

স্বাধীনতার চতুর্থ বর্ষ ধরুণ।

স্বাধীনতার চতুর্থ বৎসরে আমরা এক নতুন এবং অভাবনীয় পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলাম। আমরা 'ফসল ফলাও' আন্দোলনকে সিকেয় তুলে রেখে আমাদের সমস্ত শক্তি 'দুর্ভিক্ষ ফলাও' আন্দোলনের ওপর নিয়োজিত করলাম।

এই আন্দোলন এখন বিহারে শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি আগের আন্দোলনগুলি অসফল হলেও এই আন্দোলনে আমরা অবশ্যই সফল হব।

এই পরিকল্পনা মালথুসের 'অধিক জনসংখ্যা'র যে তত্ত্ব তার ওপর ভিত্তি করে রচিত। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রয়োজন আছে। অন্নের স্বল্পতার জন্যে দুর্ভিক্ষের প্রয়োজন আছে তা নয়, বরং ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বেশী সেইজন্য দরকার।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আওরঙ্গজেবের সময় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল মাত্র দশ কোটি। এরপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় শুরু হয়। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী একের পর এক আসে এবং দেড়শ' বছর ধরে আমরা

বিদেশী শাসনের পাঞ্জার নীচে পিষ্ট হই। এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও আমাদের জনসংখ্যা বেড়ে চলে এবং উনিশশ' সাতচল্লিশে চল্লিশ কোটিতে এসে দাঁড়ায়।

এই বিরাট কষ্টদায়ক জনসংখ্যাকে কমানোর জন্যে আমরা সর্বপ্রথমে আমাদের কৃপাবান দয়ালু এবং সহৃদয় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দেশকে দু টুকরা করে দশ কোটি মানুষকে পৃথক করে দিই। এই সুন্দর কাজের যে প্রশংসা তা আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরই প্রাপ্য। তাঁদের দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্যে আমরা দশ কোটি মানুষের যে বোঝা তার থেকে মুক্ত হয়েছি। যদি দেশ ভাগ না হত তবে এই কোটি কোটি মানুষকে আমাদের খাদ্য বস্ত্র এবং চাকুরীর জন্যে ভীষণ ভাবে চিন্তা করতে হত। পাকিস্তানের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের অন্ততঃ এইটুকু ভাবা দরকার।

স্বাধীনতার চতুর্থ বর্ষে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে।

ইংরেজীতে একটি কিংবদন্তী আছে কোন জিনিস হস্তাগত করার জন্যে তিনটি উপায় আছে: হাত পাত, ধার নাও এবং চুরি কর। জনসাধারণের কাছে আর্জি করেছি বেশী ফসল উৎপন্ন কর। কিন্তু এতে আমরা কোন সফলতা লাভ করিনি। তাই আমরা ঠিক করি আমেরিকার কাছ থেকে গম ধার নেব। এতেও সমস্যার সমাধান হল না। আর তৃতীয় উপায় ছিল চুরি করা। জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা এত চুরি করেছিলাম যে চুরি করার মতো তাদের কাছে আর কিছু ছিল না।

তাহলে আর কি করা যায়? আমাদের কাছে আর একটা উপায় ছিল, সেই উপয়ে হচ্ছে, আমাদের জনসংখ্যা অনুপাতে যদি ফসল উৎপন্ন না হয়, তবে ফসল উৎপন্নের অনুপাতে জনসংখ্যাকে কম করে দেওয়া। জনসংখ্যাকে হত্যা করার এই তত্ত্ব ছিল অর্থশাস্ত্রের মহা পণ্ডিত এবং দার্শনিক মালথুসের।

আর একজন দার্শনিক এবং অর্থশাস্ত্রের মহা পণ্ডিত বলেছিলেন—'কৃষককে জমি দাও', 'সবাই কাজ কর, উৎপন্ন কর এবং নাও' ইত্যাদি। তাঁর নাম মালথুস ছিল না, ছিল মার্কস। তিনি ছিলেন 'কমিউনিস্ট,' কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমরা আমাদের জীবন-যাত্রা কি হবে তা ঠিক করে নিয়েছিলাম। এই পথ মার্কসবাদের নয়, গান্ধীবাদের এবং মালথুসবাদের।

'দুর্ভিক্ষ ফলাও'। আমার আগে একজন চতুর মানুষ পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন 'দুর্ভিক্ষ ফলাও'-এর মতো কঠিন পরিকল্পনা কার্যকারী করার

আগে আমাদের অন্য উপায় এবং পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ ধানের ফলন বাড়ানোর জন্যে ভারতবর্ষের কৃষিযোগ্য জমির ক্ষেত্রফল বাড়ানো দরকার। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন আমাদের টুপির ওপর ধান ফলানো উচিত।

এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল প্রতিটি টুপির ওপর ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি জায়গা চাষহীন ভাবে পড়ে আছে। যদি আমরা এর ওপর কিছু মাটি ঢেলে জল ছিটিয়ে দিই তবে এই জায়গা ফলনের কাজে লেগে যাবে। আর সবার একত্রে এর ক্ষেত্রফল নিছক কম হবে না।

তিরিশ কোটি ভারতীয়, যাদের প্রত্যেকের মাথরে ওপর ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি জমি আছে তার ওপর একটু নজর দিন। সবার একত্রে এর ক্ষেত্রফল ইংলণ্ডের সমান হবে। এই খেতে আমরা গম ডাল ধান আখের চাষ করতে পারি। এতে আমরা শাক-সব্জীর মতো ছোট ছোট গাছ-গাছারিও লাগাতে পারি —যেমন কপি বেগুন শালগম ভেণ্ডি আলু প্রভৃতিরও ফলন হতে পারে। আর সবচেয়ে মজার কথা যে এই এ সমস্ত আমাদের মাথার ওপর কারমন মিরাণ্ডার মতো বোনা যেতে পারে।

আমার এই প্রতিভাবান বন্ধু বলেছিলেন, আসলে এই চিন্তা আমি কারমন মিরাণ্ডার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। মিরাণ্ডা হচ্ছেন হলিউডের একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। আমি তাকে বললাম, এ কথা ঠিক। আমেরিকার গম যদি আমরা না পাই, আমেরিকার চিন্তা তো নিতে পারি। এতে খারাপের কি আছে। আপনি আমাদের মিনিস্টারদের আশীর্বাদ নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করে দিন। আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা এবং 'পাবলিক সেফটি এ্যাক্টের' জন্যে মন্ত্রীদের আশীর্বাদ ছাড়া কোন পরিকল্পনা এবং আন্দোলনই সফল হয় না।

আমার বন্ধু নৈরাশ্যের সঙ্গে মাথা হেলিয়ে বললেন, এতে এক বাধা আছে। আমার ভয় আমাদের মন্ত্রীরা এই ভাবনা এবং পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হবেন না। তুমি কি ভাবতে পার কোন মন্ত্রী তাঁর টুপির ওপর টমাটো, পেয়াজ, পাট এবং তুলোর গাছ লাগানো পছন্দ করবেন!

আমি বললাম, 'না'। এবং আমরা এ পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম।

'দুর্ভিক্ষ ফলাও' পরিকল্পনা নিয়ে আমি যতই ভাবি, ততই এই পরিকল্পনাকে আমার যথার্থ এবং ভালো মনে হয়। জমিদারী জায়গীরদারী কালোবাজারী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যদিও আমরা ধ্বংস করতে পারিনি, আসুন দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমরা জনতাকে শেষ করে দিই। কয়েক বৎসর

পূর্বে বাঙলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেই রকম যদি কয়েকটি দুর্ভিক্ষের জন্ম আমরা দিতে পারি তবে অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষে মাত্র পয়ত্রিশ লাখ লোক মারা গিয়েছিল। এ এমন কিছু নয়। এতে আমাদের বিপদ দূর হবে না। এবার এমন এক সিংহের মতো পরাক্রমশালী দুর্ভিক্ষ আনতে হবে যাতে করে কমপক্ষে কয়েক কোটি লোক মারা যায়। আমাদের অহিংস গান্ধীবাদী পরমাণু বোমার প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে ধরিত্রীর বোঝা হালকা হয়ে যাবে আর আমাদের মহান দেশভক্ত জায়গীরদার জমিদাররা খুব সুখে থাকতে পারবে।

যদি এই অপ্রত্যাশিত দুর্ভিক্ষেও আমাদের আকাঙ্খিত সংখ্যার জনতা পৃথিবী থেকে সরে না যায় তবে অন্য সহযোগী উপায়ও আমরা প্রয়োগ করতে পারি। যেমন ঃ

১. কৃষক আন্দোলনকে ধ্বংস কর।

২. ছাত্র আন্দোলনকে ধ্বংস কর।

৩. সমস্ত বিরোধী দলকে ধ্বংস কর।

আমার বিশ্বাস যদি এই সমস্ত উপায়ই আমরা একসঙ্গে কাজে লাগাই তবে খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বিপদ এবং সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পাব। কিন্তু এই পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করছে মৃত্যুর সংখ্যার ওপর।

শুনেছি চীনে এই সমস্ত উপায়ই প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি। তারা সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উপায়ও প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বেড়েই গিয়েছে। কুওমিনটাঙ, মার্কিনী হস্তক্ষেপ, অনাহার মহামারী সত্ত্বেও চীনের জনতা শক্তিশালী হতে লাগল। শুনছি ভারতবর্ষেও জনতা শক্তিশালী হবে, কারণ জনতা হচ্ছে অমর।